□

১৭.০ উদ্দেশ্য

১৭.১ প্রস্তাবনা

১৭.২ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা

১৭.৩ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

১৭.৪ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি

১৭.৫ অনুশীলনী

১৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জানা যাবে—

- রাষ্ট্রচর্চায় সমাজের ভূমিকা কেন আলোচ্য
- রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বিষয়টির কীভাবে উদ্ভব হল ও তার পরিধির মধ্যে কী কী পড়ে
- এই সমাজতত্ত্ব আলোচনায় বিভিন্ন চিন্তাবিদের অবস্থান ও অবদান
- সেই সঙ্গে রাজনীতিতে সক্রিয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যোগাযোগ, রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তি এবং রাজনৈতিক উন্নয়নেরও দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে।

যে কোনও দেশে, যে কোনও সময়ে সমাজবদ্ধ মানুষই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশকাল ভেদে রাজনীতিতে সক্রিয় মানুষের আনুপাতিক সংখ্যার তারতম্য ঘটলেও, এই কথা অনস্বীকার্য যে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে—অর্থাৎ, মানুষ তার বিশেষ সামাজিক অস্তিত্বকে বহন করে নিয়ে গেছে রাজনীতির অঙ্গনে। অন্যদিকে, রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু চিরকালই সমাজ—তা সমাজকে কমবেশি নিয়ন্ত্রণ করা, রক্ষা করা বা পরিবর্তন করা যাই হোক না কেন। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে মানুষের সামাজিক অবস্থান, স্বার্থ ও রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাস্তবে থাকলেও তা আমাদের চেতনায় ও জ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে অপেক্ষাকৃতভাবে সাম্প্রতিককালে। মানুষকে কেন্দ্র করে সমাজ ও রাজনীতির এই আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে চর্চা করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী জিওভান্নি সারতোরি (Giovanni Sartori) মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে অন্যতম সেতু স্থাপন করেছে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব নানা বিষয়ের মিশ্রণে উদ্ভূত একটি সঙ্কর যার লক্ষ্য সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ও তত্ত্বের উপকরণগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে এই সংযোগস্থাপনের প্রচেষ্টা?

এই প্রচেষ্টার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারণা—এক, সমাজ ও রাজনীতি আমাদের জীবনে পৃথক এলাকা দখল করে আছে, এবং দুই, সমাজ ও রাজনীতির কক্ষপথগুলি প্রায়শই একে অপরকে ছেদ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জাত-ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান, ও সেই দিক দিয়ে চরিত্রগতভাবে সামাজিক। অন্যদিকে, সংবিধান ও সংবিধানকে অনুসরণ করে সৃষ্টি হওয়া আইন রাজনীতির এলাকাভুক্ত ও চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক। সুতরাং, চরিত্রগতভাবে জাত-ব্যবস্থা ও সংবিধান, আইন ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্র যখন সাংবিধানিক আদর্শকে মান্য করে নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আইনের মাধ্যমে, তখন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়। সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন করার সময়ে রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবে সরকার যেমন বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর চাপ বা প্রভাবের স¥œÅàÏò

(Tom Bottomore)

¥¤ ("Political Sociology is concerned with power in its social context")

১৯১৪-১৮

১৯৩৯-৪৫

—

—

১৭.৩ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

(Aristotle) polis

‘Koinonia’

(Marsiglio)

W. G. Runciman,

Tom Bottomore,

Civil Society

(Alexis De Tocqueville, 1805-1859)

(Max Weber)

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalian (1904)

(Vilfredo Pareto), (Gaetano Mosca), (Robert Michels) Michels

¥¤ ("Government by the people")

¥¤ ("Administration of men will be replaced by the administration of things")

¥¤

—

১৭.৪ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি

¥¤

(Green) ও অরলিয়েন্স (Orleans)-এর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্র নামক একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় :

১) রাষ্ট্রের কাঠামো;

২) বৈধতার চরিত্র ও শর্তাবলী;

৩) একচেটিয়া শক্তির প্রকৃতি ও রাষ্ট্র-কর্তৃক তার ব্যবহার;

৪) রাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংগঠনগুলির চরিত্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।

গ্রিন ও অরলিয়েন্স-এর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের তত্ত্ব ও গবেষণাগুলির দৃষ্টি দেওয়া উচিত এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর যেমন, ঐকমত্য ও বৈধতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অপর আর এক বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু এফরাট (Andrew Effraft) অবশ্য এই বিষয়টির স¥ন্ধে একটি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি অবল¥ন করেছেন। তাঁর বিচারে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সকল সামাজিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পদ্ধতি ও বণ্টনের কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন পরিবার, শিক্ষা সংক্রান্ত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সরকারি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক সেইমুর মার্টিন লিপসেট (Saymoor Martin Lipset) মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি সমাজের স্থায়িত্ব সাধারণভাবে সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়, তা হলে বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লিপসেট ও আর. বেনেডিক্ট (S. Lipset ও R. Bendict). সুপারিশ করেছিলেন যে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির :

১) নির্বাচনী আচরণ;

২) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩) স্বার্থগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শ;

৪) রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠন;

৫) আমলাতন্ত্র ও তার সমস্যা।

আলি আশরফ (Ali Ashraf) ও এল. এন. শর্মা (L. N. Sarma)-র মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের দৃষ্টি চারটি এলাকায় নিবদ্ধ থাকা উচিত, যথা, (ক) রাজনৈতিক কাঠামোগুলি (যেমন সামাজিক শ্রেণী বা

জাতপাত, এলিট গোষ্ঠী, স্বার্থ গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও উপদল); (খ) রাজনৈতিক জীবন (অর্থাৎ, নির্বাচন পদ্ধতি, রাজনৈতিক সংযোগ, মতামত গঠন ইত্যাদি); (গ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব (তার ভিত্তি ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতা কাঠামোর শ্রেণীবিভাগ ও কার্যপদ্ধতি; (ঘ) রাজনৈতিক উন্নয়ন (ধারণা ও পরিমাপের সূচকগুলি, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজ পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক)।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কাঠামো, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছে। কিন্তু এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যথেষ্ট সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও খুব একটা স্পষ্ট কোনও তাত্ত্বিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়নি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা সাধারণভাবে আইনগত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি, গোষ্ঠীস্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি, ও ব্যক্তির স্তরে পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন। এলিট তাত্ত্বিকেরা ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা আদর্শবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব সৃষ্টির থেকে বিরত ছিলেন।

১৭.৫ অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

১।

২।

৩।

৪।

৫।

১৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। S. M. Lipset : Politics and the Social Sciences. (Chapter - 4)

২। Michael Rush : Politics and Society.

৩। Tom Bottomore : Political Sociology.

৪। W. G. Runciman : Social Science and Political Theory. (Ch. II)

৫। Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology.

□

১৮.০ উদ্দেশ্য

১৮.১ প্রস্তাবনা

১৮.২ ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়

১৮.২.১. ক্ষমতার সামাজিক সংগঠন

১৮.৩ ক্ষমতার উপাদান

১৮.৪ ক্ষমতার সম্পর্ক

১৮.৫ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বৈধতা

১৮.৬ বৈধতার উৎস ও প্রকারভেদ

১৮.৬.১ কর্তৃত্বের আদর্শ বা বিশুদ্ধ প্রকারভেদ

১৮.৬.২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক

১৮.৭ অনুশীলনী

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে বুঝতে সুবিধে হবে—

- রাজনৈতিক সামাজিক অর্থে ক্ষমতার স্বরূপ কী
- ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে কীভাবে নানাবিধ ক্ষমতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়
- ক্ষমতার অবিরত প্রয়োগের স্বার্থে তাকে বৈধতা প্রদান করা হয় কোন্ কোন্ উপায়ে
- ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্তৃত্ব কী কী রূপ পরিগ্রহ করে এবং
- এর থেকে কর্তৃত্বের কোনও বিশুদ্ধ রূপ নির্দেশ করা যায় কিনা

আগের এককটি পড়বার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল ক্ষমতা। রাজনৈতিক স্তরে এই ক্ষমতার ব্যবহার-সমাজে কর্তৃত্বের বণ্টন ঘটায় এবং তার থেকে উদ্ভূত হয় সমাজ সম্পর্কের বৈচিত্র্য। নানা উপাদানের সংমিশ্রণে ক্ষমতার এক এক ধরনের কাঠামো গড়ে ওঠে।

এর জটিলতাও কম নয়। সুতরাং, বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমাদের দেখতে হবে রাজনৈতিক-সামাজিক অর্থে ক্ষমতার স্বরূপটি কীরকম এবং মানুষের সমাজ-সম্পর্ক রচনায় কি তার প্রভাব। ক্ষমতার অর্থই হ'ল কোনও না কোনও স্তরের বিন্যাস রচনা, যার মধ্যে কর্তৃত্ব আছে, অধীনতাও আছে। এছাড়া ক্ষমতা হাতে থাকাই যথেষ্ট নয়। এর প্রয়োগ যাতে সহজ ও সুগম হয় সেটাও নিশ্চিত করা দরকার। অর্থাৎ, কর্তৃত্ব বলতে শুধু জোর-জুলুম নয় তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার—স্বাভাবিক আনুগত্যের। সেই আনুগত্য অর্জনেরই অন্য নাম বৈধতা। এ জন্য যেসব কৌশল অবল¥¤ন করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ যে সব রূপ ধারণ করে থাকে তার সম্যক ধারণা ছাড়া সমাজকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না।

ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়

(domination-subordination)-

১৮.৩ ক্ষমতার উপাদান

(rules of property)

— —

১৮.৪ ক্ষমতার সম্পর্ক :

—

১৮.৫ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বৈধতা

¥¤

১৮.৬ বৈধতার উৎস ও প্রকারভেদ

১৮৬৪-১৯২০

(Tradition);

¥œ (Charisma) (Legal- rationality)

— (Traditional),

¥œ (Charismatic) (Legal-rational)

(ক) পরম্পরা-ভিত্তিক বা সাবেকী কর্তৃত্ব :

"The authority of the 'eternal yesterday' ",

(domination-subordination)

১৭৮৯

(খ) গণস¥œাহনী কর্তৃপক্ষ :

Charisma ¥œ

— ¥œ

¥œ

¥œ

¥œ

¥œ

“routinisation charisma”

¥œ

¥œ

¥œ

(গ) আইনগত ও যুক্তি-ভিত্তিক কর্তৃপক্ষ :

¥

¥¤

—

—

১৮.৬.১ কর্তৃত্বের আদর্শ বা বিশুদ্ধ প্রকারভেদ :

‘Ideal types’,

¥œ ¥œ

¥œ

১৯৭১

১৮.৬.২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক

¥œ

(Herrschaft) তার ইংরাজী প্রতিশব্দ দু'টি—কর্তৃত্ব (authority) বা আধিপত্য (dominance)। যদি ওই শব্দটিকে আমরা 'কর্তৃত্বের' অর্থে ব্যবহার করি, যেমন সমাজতাত্ত্বিক ট্যালকট পার্সন্‌স (Talcott Parsons) করেছিলেন, তাহলে এই ধারণাকে গ্রহণ করতে পারি যে কর্তৃপক্ষ হিসাবে শাসকেরা শাসিতের স্বেচ্ছায় দেওয়া বৈধতা অর্জন করে। বিপরীতে শব্দটি যদি আমরা 'আধিপত্যের' অর্থে ব্যবহার করি, তাহলে বিশ্বাস করতে পারি যে, শাসকেরা বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায় অবল¥¤ন করে শাসিতের কাছ থেকে বৈধতা আদায় করে। বাস্তবে ক্ষমতার প্রতিভূ হিসাবে শাসকেরা শাসিতের বৈধতার উপর নির্ভর না করে, বা তার জন্য অপেক্ষা না করে, বৈধতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। হ্বেবারও তাই বিশ্বাস করতেন।

অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১)

২)

৩)

৪)

৫)

৬)

৭)

৮) ¥œ (charismatic) ¥¤

৯) ¥¤

খ) রচনাত্মক প্রশ্ন :

১)

২)

৩)

৪)

৫) ¥¤

৬)

গ্রন্থপঞ্জী

১ Alan R. Ball : Politics and the Government.

২ David Bethan : The lazitimation of power. (Ch. II)

৩ Dennis Wrong : Power—Its forms, bases and uses. (Ch. I)

৪ Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology.

□ (Bureaucracy)

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ প্রস্তাবনা

১৯.২ আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা

১৯.২.১. আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব, উদ্ভব ও বিকাশ

১৯.২.২. আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১৯.২.৩. আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

১৯.২.৪. আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী

১৯.২.৫. আমলাতন্ত্রের ত্রুটি

১৯.২.৬. আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ

১৯.২.৭. আমলাতন্ত্রের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

১৯.৩ ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণা

১৯.৩.১. ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের প্রকৃতি

১৯.৩.২. ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১৯.৩.৩. হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্বের ত্রুটি

১৯.৪ কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্রের ধারণা

১৯.৫ সারাংশ

১৯.৬ অনুশীলনী

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
- আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী, ত্রুটি ও নিয়ন্ত্রণ
- ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণা

- হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণার ত্রুটিগুলি কী কী
- কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্রের ধারণার মূল বক্তব্য

১৯.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আলোচনা করা হয়েছে আমলাতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থায়ী কর্মচারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল স্থায়ী কর্মচারীরা আমলা হিসেবে পরিচিত। এদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা "আমলাতন্ত্র" (Bureaucracy)

১৯.২ আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা

(Bureaucracy)

(Bureau) (Kratin) "Bureau"

(Writing table or Deask), "Kratin"

(Government) "Bureaucracy"

The term "signifies the concentration of

administrative power in bureaus or departments, and the undue interference by officials in matters outside the scope of state interference".

(experience), knowledge (responsibility) ¥¤

'Willoughby'-

'Any personnel system where the employees are classified in a system of administration composed of a hierarchy of sections, divisions, bureaus, departments and the like'.

— (Political Executive)

(Non-political Executive)

(Finer)

(Max Weber)

আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল আমলাতন্ত্রের উদ্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। অধ্যাপক বার্কার যথার্থই বলেছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বিংশ শতাব্দীতে তেমনি প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গণতান্ত্রিক অ-গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট এমনকি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলিতেও আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব বিরাজমান। আমলাতন্ত্র আজ প্রায় সকল শাসনব্যবস্থার অংশ। লা পালো¥¤ারা (La Palombara) আমলাতন্ত্রের বিকাশের কতকগুলি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায় হল ক্যাথলিক গির্জার সম্প্রসারণ। ক্যাথলিক গির্জাগুলি সারা ইউরোপে সম্প্রসারিত হওয়ার দরুন পূর্বতন শাসনব্যবস্থার পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তনের

প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বিতীয় পর্যায় হল সামরিক বাহিনীর উন্নতি। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সামরিক বাহিনীতে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটা করতে গিয়ে সামরিক বাহিনী দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং জন্ম নেয় আমলাতন্ত্র। তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় যে, জাতীয় রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে রাজ্য বা শাসকের পক্ষে কেবল পরামর্শদাতাদের সহায়তায় প্রশাসন পরিচালনায় যথেষ্ট নয়। দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজনও অনুভব করা হয়।

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধির বা উদ্ভবের বা বিকাশের কতকগুলি কারণ আছে। এই কারণগুলি ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, যথাক্রমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। সামাজিক কারণ হল, ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ছিল পুলিশী রাষ্ট্র (Police state)। এই রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রের কার্যাবলী নেতিবাচক ছিল। কিছু কিছু লেখক, সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা ও চিন্তাবিদরা নতুন নতুন চিন্তা ও ধারণার জন্ম দিয়ে থাকেন। ফলে সমাজে নানারকম সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি হয়। জনগণের মনে নানারকম দাবিদাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার ধারণা তৈরি হয়। এই দাবিদাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের রাষ্ট্রের কাছে নানারকম অধিকার প্রাপ্তির জন্য আবেদন আসতে থাকে। যে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ছিল নেতিবাচক, সেই রাষ্ট্রের কার্যাবলী ইতিবাচকে পরিণত হয়। রাষ্ট্রকে নানারকম সামাজিক সমস্যার সমাধানে লিপ্ত থাকতে হয়। ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুলিশী রাষ্ট্র এই শতাব্দীতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কারণেও আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সমাজ- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের মঙ্গলসাধন ও অবস্থার উন্নতিকল্পে নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে সরকারকে নীতি গ্রহণ ও কার্য রূপায়ণ করার জন্য আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ণে আমলাতন্ত্রের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। আমলাদের কর্মনিপুণতা, দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার উপর সরকারের কার্যাবলীর বাস্তবায়নের কাজ সহজ হয় এবং সে কারণে আমলাতন্ত্রে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে ধীরে ধীরে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তৃতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসদের কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে পড়েছে। সরকার নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জনকল্যাণকামী কর্মসূচী গ্রহণ করায়, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্দশাগত ব্যক্তিদের সাহায্য, বেকার সমস্যা, শিল্পায়ন, মজুরী কাঠামো, বৈদেশিক নীতি, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে সরকার নানারকমের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। আইন প্রণয়ন কিংবা সরকারি নীতি নির্ধারণের জন্য যে পরিমাণ কলাকৌশলগত জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা আইনসভার সদস্যদের অথবা সকল মন্ত্রীদের থাকে না। তাই তাঁরা সরকারের সাধারণ নীতি কিংবা আইনের মৌলনীতিগুলি নির্ধারণ করে সেগুলিকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য স্থায়ী, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ আমলাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে আমলাদের গুরুত্ব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রশাসনিক কাজে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন সরকারের স্থায়ী কর্মচারীরাই। আমলাদের উৎসাহ, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর সরকারি পরিকল্পনাসমূহের সাফল্য নির্ভর করে। বিশেষ করে,

বিকাশশীল দেশগুলিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় রাজনৈতিক কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে আমলাতন্ত্র।

১৯.২.২ আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আমলাতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাঠামোগত দিক থেকে আমলাতন্ত্র হল মানব সম্পর্কের সংগঠিত রূপ। শ্রমবিভাগ ও ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস এই রূপকে প্রতিফলিত করে। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল (১) নির্দিষ্ট ও স্থায়ী অধিক্ষেত্রের অবস্থিতি; (২) কর্তৃত্বের ধাপ ও ক্রমপর্যায়ী নীতি; (৩) কার্য ও দায়িত্বের রীতিস¥ ৪

৫ ৬

৭

Neutrality is the hall mark of bureaucracy.

(Eva Etgioni Halevy)

Bureaucracy and Democracy “Civil servants usually have their own views on matters of policy but are not free to indulge in their partisan sympathies freely. Their allegience to one party or another is subordinated to the requirements of their profession”.

(flexibility)

(anonymity) (accountability)

(rank system)
(Carl Fredrich)

১ ২
৩ ৪
৫ ৬

(Merit)

১৯.২.৩ আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

(M. Fainsod)

— ১

(Representative bureaucracies); ২ (Party-state bureaucracies); ৩ (Military dominated bureaucracies); ৪ (Ruler dominated bureaucracies); ৫ (Ruling bureaucracies)

—(**(Guardian bureaucracy) :**

১৬৪০ ১৭৪০

(Caste bureaucracy) :

(Patronage bureaucracy) :

(The spoils system)

(Merit Bureaucracy) :

১৮৮৩

১৯.২.৪ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী

—

— ১ ২

৩ ৪ ৫

৬

১৯.২.৫ আমলাতন্ত্রের ত্রুটি ও নিয়ন্ত্রণ

"A system of Government the control of which is so completely in the hands of the officials that their power jeopardizes the liberties of the ordinary citezens".

(Lord Hewart) New Despotism

—

(Ramsay Muir)

How Britain is Governed-

¥¤

‘Bureaucracy is liable to suffer from certain persistent maladies’
(E. Strama)

“Bureaucracy is identified with a rigid, mechanical, wooden, inhuman, formal and soulless approach.”

—(ক) উদাসীনতা : (unresponsiveness)

(খ) ঐতিহ্যপ্রিয়তা ও রক্ষণশীলতা :

(Bertrand Russell)

(গ) অনুষ্ঠানসর্বস্বতা ও দীর্ঘসূত্রতার মনোভাব :

(ঘ)

ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ক্ষমতা লাভ : Bureaucrats have an inherent lust for power.

(ঙ) বিভাগীয় মনোভাব **(departmentalism) :**

(strauss)

(চ) আত্মবিচারস্থায়ীকরণ **(self-pirpetuating) :**

আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ

১৯৫০

—The need for controlling bureaucratic discretion and power is apparent in every political system.

(hierachy)-

(Select Committee), সরকারি হিসাব রক্ষক কমিটি (Public Account Committee) প্রভৃতির মাধ্যমে আমলাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

আইনগত নিয়ন্ত্রণ হল আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম উপায়। কর্তব্যে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতির বিচার সাধারণ আইনের সাহায্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের মাধ্যমে সম্পাদিত হলে আমলাদের সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে সাধারণ আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত্যকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। আদালত প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু প্রশাসনিক অযোগ্যতাকে প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতা আদালতের নেই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চপদস্থ আমলাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচারের জন্য প্রশাসনিক আদালত, সংসদীয় কমিশনার, অ¥য়ুডসম্যান (Ombudsman) ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এঁদের ক্ষমতা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। এ বিষয়ে ভারতীয় সংগঠন হল লোকপাল (Lok Pal) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাদের দুর্নীতিপরায়ণ হবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, তাঁরা রাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজ গঠনে এবং জনগণের স্বার্থসাধনে আমলাতন্ত্রকে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯.২.৭ আমলাতন্ত্রে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

(Elites) (administrator elites)

'The French National School of administration'-

(Second University

Degree) ১৮

‘Civil Service Commission’

(merit)

(Union Public Service Commission)

(Public Service Commission)

ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণা

ম্যাক্স হ্বেবারকে আমলাতন্ত্রের ধারণার পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর আলোচনায় সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তাধারা ও মতামত পরবর্তীকালের লেখকদের আলোচনায় প্রভাব ফেলে থাকে। যদিও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারণা সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক, তথাপিও তাঁর ধারণা রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের সমসাময়িক বলা যেতে পারে। পুঁজিবাদ, শিল্পবিপ্লব এবং সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র-তত্ত্ব বিশেষ সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর তত্ত্বটি তাঁরই ইতিহাস ও সামাজিক তত্ত্বের ব্যাপ্ত জ্ঞানের অন্তর্নিহিত অংশ।

১৯.৩.১ ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের প্রকৃতি

ম্যাক্স হ্বেবার আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতা (power) (dominace)

‘Herrchaft’

Herrchaft

Herrchaft

Herr Herrchaft-

১ (Traditional authority); ২ (Charismatic authority); ৩ ¥œ (Legal rational authority)

(Ideal or pure type)

¥œ

ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(division of Labour)

(objectivity), (discretionary), (precision) (consistency)

(Capitalist market economy)

১

২

৩

৪

৫

ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্বের ত্রুটি

(machine theory)

(Peter Blau)

(ideal type construct)

A product of alien culture

—

১৯.৪ কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্রের ধারণা

¥¤

(views)

Philosophy of Right-

(closed chapter)

“The 18th Brumasre of Louis Bonaparte”

“Where bourgeois’ life and activity begin, the power of the state bureaucracy ends”.

সারাংশ

¥œ

¥œ

—

—

১৯.৬ অনুশীলনী

১।

২।

৩।

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Aron, Raymond : Main Currents in Sociological Thought ; V.2, Penguin Books, England and U.S.A., 1967.

২। Bhattachariya, Mohit : New Horizons of Public Administration, Jawahar Publishers, 1998, New Delhi.

৩। দেবাশীষ ভট্টাচার্য : গণ প্রশাসন পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

□

২০.০ উদ্দেশ্য

২০.১ প্রস্তাবনা

২০.২ প্যারেটোর তত্ত্ব

২০.৩ মসকার তত্ত্ব

২০.৪ মিশেল্‌সের তত্ত্ব

২০.৫ অনুশীলনী

২০.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি প্যারেটো, মসকা ও মিশেল্‌সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (Elite) সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করবেন। বিশেষত, এই অধ্যয়নের ফলে—

- শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কাদের বলে তা জানতে পারবেন
- বিভিন্ন ধরনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কীভাবে ক্ষমতায় আসীন হয় এবং ক্ষমতাচ্যুত হয় সে সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করবেন
- সংখ্যালঘু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর শাসন কায়েম করে সেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন এবং
- রাজনৈতিক দলগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে কীভাবে দলীয় নেতাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অনমনীয় কর্তৃত্ব কায়েম হয় তা জানতে পারবেন।

সকল সমাজেই একটি সংখ্যালঘু মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যারা উৎকর্ষে উচ্চতর। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কিছু বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং বিশেষ কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই শাসনের অধিকার অর্জন করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গই হলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনজন ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী—প্যারেটো, মসকা এবং মিশেল্‌স্‌। এঁরা তিনজনই ম্যাকিয়াভেলির আধুনিক অনুগামী রূপে পরিচিত। এঁরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী। এঁরা মার্ক্সবাদেরও বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তিগত মালিকানাবিহীন সমাজে শ্রেণী বিলোপের মার্ক্সীয় তত্ত্বে আপত্তি জানিয়ে এঁরা বলেছেন যে, সকল সমাজেই শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে। এঁদের মতে, শাসন করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মানুষেরই থাকে যারা প্রশাসনিক যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা সম্পন্ন। এঁদেরই শাসন করা উচিত এবং বাস্তবে এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গই শাসনকার্য পরিচালনা করে এসেছে ও ভবিষ্যতেও করবে। এটা শুধু বাস্তব নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে।

বর্তমান এককের পরবর্তী অংশে প্যারেটো, মসকা ও মিশেল্‌সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ বিশদে আলোচিত হল।

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ভিলফ্রেডো প্যারেটোর (Vilfredo Pareto) মতে, মানুষ যেমন শারীরিকভাবে, তেমনি মানসিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ্যের দিক দিয়েও অসমান। যে কোনও গোষ্ঠীতে যারা সর্বাপেক্ষা সমর্থ তাদেরই প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ('elites') বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় তিনি কোনও নৈতিক গুণমান ও স¥œানসূচক তাৎপর্য আরোপ করেননি। এই শব্দটির দ্বারা তিনি শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন যে, কোনও কর্মগত ক্ষেত্রে যারা সর্বাধিক সাফল্যের সূচকের অধিকারী—সফল ব্যবসায়ী, সফল লেখক, সফল উকিল, সফল শিল্পী—এর সকলেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তবে প্যারেটোর মতে, একমাত্র পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত সমাজে—কেবলমাত্র তাত্ত্বিক স্তরেই যার অস্তিত্ব—শ্রেষ্ঠত্বের অভিধার সাথে সর্বাধিক দক্ষতার পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব জগতে পারিবারিক যোগাযোগ বা পরিচিতি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মর্যাদা অর্জনের পথে কিছুটা হেরফের ঘটায়। এর ফলে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন ও সর্বাধিক দক্ষতার প্রকাশের মধ্যে কিছুটা গরমিল দেখা দেয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (ruling and non-ruling elites)। দেশের শাসনকার্যে শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে শৃগালের মতো প্রতারণার দ্বারা অথবা সিংহের মতো বলপ্রয়োগের দ্বারা এরা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাকিয়াভেলির পরিভাষা অনুসরণ করে প্যারেটো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে 'শৃগাল' ও 'সিংহ'—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শৃগালগণ নমনীয়ভাবে পরিবেশ বা পরিস্থিতিগত প্রয়োজনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। এরা আদর্শবাদী (ideology) উদ্দেশ্যের তুলনায় বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে বেশি প্রাধান্য দেয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীতি বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। প্রচার ও প্রতারণার দ্বারা এরা ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। কূটনৈতিক রফার মাধ্যমে এরা রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস করে। কিন্তু সিংহগণ হল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও দেশের প্রতি এরা প্রবল আনুগত্য দেখায়। এদের

মধ্যে আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রাধান্য দেখা যায়। এরা শ্রেণীভিত্তিক একতাবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রয়োজন দেখা দিলে বলপ্রয়োগে এরা ভয় পায় না বা দ্বিধা করে না। এরা বলপ্রয়োগের দ্বারাই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে।

প্যারেটোর মতে, আদর্শ শাসককুল একই সাথে সিংহোপম ব্যক্তিবর্গ—যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে এবং কার্যসম্পাদন করতে সক্ষম এবং শৃগালোপম ব্যক্তিবর্গ—যারা কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভাবনক্ষম এবং বিবেকহীন—উভয়কে নিয়ে গর্বিত হবে। শাসককুলের মধ্যে যখন এই বিপরীতধর্মী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শাসনক্ষমতা অনমনীয় আমলাতন্ত্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, যারা নবীকরণ ও পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে অক্ষম নয়, সেইসব কলহপ্রবণ আইনজ্ঞ ও বাগাড়ম্বরকারীদের উপর শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হয়, যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যসম্পাদনে অপারগ। এরকম ক্ষেত্রে শাসিত জনগণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তখন একটি আরও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

প্রত্যেক সমাজেই সম্ভাব্য এবং অসন্তুষ্ট নেতারা থাকে। এদের হয় শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে অথবা অপসারিত করতে হবে। যখন কোনও শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকে, তখন তারা বলপ্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকলার চর্চায় মেতে থাকতে পারে। তারা অত্যন্ত সহনশীল ও সংযত হয়ে পড়তে পারে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করার প্রবণতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এসময়ে সিংহোপম নেতৃবর্গ (যারা শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত নয়) জনসাধারণকে শৃগালোপম শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। এভাবেই শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গড়ে ওঠে, শাসন করে, অবক্ষয়ের স¥œÅখীন হয় এবং পরিশেষে নতুন শাসককুল দ্বারা অপসারিত হয়। প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, "অভিজাততন্ত্রসমূহ স্থায়ী হয় না।...ইতিহাস অভিজাততন্ত্রসমূহের কবরখানা।...বিদ্যমান ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হল নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতম গুণাবলী জড়ো হওয়া এবং, উল্টোদিকে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম গুণাবলী জড়ো হওয়া।" ("Aristocracies do not last...History is a graveyard of aristocracies...Potent cause of disturbance in the equilibrium is the accumulation of superior elements in the lower classes and, conversely, of inferior elements in the higher classes.")

শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকলে আরও একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত নতুন সমর্থ ব্যক্তিবর্গকে, অর্থাৎ সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে, নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগ ও অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তন এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য বিচলিত হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা অবক্ষয়ের স¥œÅখীন হয়। যদি শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শাসিতশ্রেণীর স¥œুখে অবস্থানকারী অসাধারণ ব্যক্তিদের নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা না করতে পারে, তবে আকস্মিক সামাজিক পরিবর্তন বা রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন ও শাসনে সক্ষম শাসকশ্রেণী পুরাতন শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

প্যারেটোর মতে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্স ও ইতালিতে, শৃগালদের উত্থান ঘটেছিল। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল রাজনীতির কারবারীরা, নীতিহীন আইনজীবীরা, কুতার্কিক বুদ্ধিজীবীরা, ফাটকাবাজরা ও কৌশলপূর্বক নিজ-উদ্দেশ্যসধনকারীরা। কিন্তু তিনি পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত

লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অতীতের মতো এখনও রক্ষণশীল, ধৈর্যশীল ও বলপ্রয়োগে সক্ষম সিংহদের উত্থান ঘটবে এবং তারা বলপ্রয়োগে অক্ষম ও প্রতারণাশীল শৃগালদের অপসারণপূর্বক শাসনক্ষমতা দখল করে নেবে। দেশাত্মবোধ, বিশ্বাস, জাতীয় মর্যাদাবোধ সকলের আনুগত্য আদায় করে নেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেদের বুদ্ধিবলে শৃগালরা আবার ক্ষমতা দখল করবে। শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন এইভাবে চলতেই থাকবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শৃগাল ও সিংহের উপস্থিতির মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও 'ফাটকা কারবারী'—যারা শৃগালসদৃশ এবং 'নির্দিষ্ট উপার্জনভোগী'—যারা সিংহসদৃশ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি প্যারেটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এদের স্বার্থ যে শুধু ভিন্ন তাই নয়; এদের মানসিকতাও আলাদা। এই দুটি গোষ্ঠী সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতাপূর্ণ কার্য সাধন করে। ফাটকা কারবারীদের গোষ্ঠী মূলত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি আনয়নে সহায়তা করে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের গোষ্ঠী স্থায়িত্ব রক্ষায় সাহায্য করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারীদের ঝুঁকিবহুল আচরণ থেকে উদ্ভূত বিপদ-আপদ নিবারণ করে। যে সমাজে নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীরা প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে তা নিশ্চল এবং যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। যে সমাজে ফাটকা কারবারীদের প্রাধান্য তা স্থায়িত্বের অভাবে ভোগে, এক দুর্বল ভারসাম্যগত অবস্থায় বিরাজ করে যা ভেতরের এবং বাইরের সামান্য দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পরে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শৃগাল ও সিংহদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারী ও নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানই প্রয়োজনীয় সমতা ও নিয়ন্ত্রণ যুগিয়ে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

বিবর্তন ও প্রগতির ধারণাকে প্যারেটো অর্থহীন মনে করতেন। তাঁর মতে, শৃগালতুল্য ব্যক্তি ও সিংহতুল্য ব্যক্তিদের সমাজে আধিপত্য চক্রাকারে আবর্তন করেই চলবে। এই প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যের ভরকেন্দ্র পাল্টালেও ভারসাম্য বিরাজ করবেই। প্যারেটোর মতে, ইতিহাসের পথ বেয়ে নতুন কিছু সংঘটিত হয় না। ইতিহাস মানবীয় নির্বুদ্ধিতার বিবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বর্গরাজ্য কোথাও নেই।

প্যারেটোর তত্ত্বের বেশ কিছু বক্তব্য স¥¤ন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে; যেমন, প্যারেটোর মতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তনকে অর্গলবদ্ধ করলে সামাজিক ভারসাম্যর হানি হবে। এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবে এবং নতুন একটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী ক্ষমতা অধিকার করবে। অর্থাৎ, কোনও আবদ্ধ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকতে পারে না, সেই গোষ্ঠীর অবসান অনিবার্য। বটোমোর (Tom Bottomore) কিন্তু প্যারেটোর এই বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন যে, আবদ্ধ গোষ্ঠী মাত্রেরই অবসান অনিবার্য একথা বলা চলে না। যেমন, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন কাল থেকে ব্রাহ্মণরা আবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অন্য কোনও নিম্নবর্গের মানুষের এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। অথচ, আবহমানকাল ধরে ব্রাহ্মণরা তাদের এই আবদ্ধ গোষ্ঠীগত অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্যারেটোর তত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ সর্বক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। এ কারণে অনেকে প্যারেটোর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বটিকে অনৈতিহাসিক বলে অভিযুক্ত করেন। তবে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভারতের সামাজিক বাস্তবতাও এই তত্ত্বকে

অনেকাংশেই সমর্থন করে। জাতপাতের পুরনো বিধান সত্ত্বেও বর্তমান রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক স্তরেও ব্রাহ্মণগণ যে আগের মতো নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভোগ করেন না তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে কিংবা মুখ্য উপদেষ্টার ভূমিকায় অথবা প্রশাসনে অব্রাহ্মণদের (এমনকি কিছু পরিমাণে নিম্নবর্গেরও) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ওপরে উঠে আসা এখন অতি পরিচিত ঘটনা। ব্রাহ্মণ বংশজাত মানুষের এখন যেটুকু কর্তৃত্বের অধিকারী সেটা সম্ভব হয়েছে কৌলীন্যের আবদ্ধ অস্তিত্বের জন্য নয়; বরং সামাজিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন শিক্ষাদীক্ষায় পটুত্ব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের উপযুক্ত মনোভাবের ফলে।

মসকা (Gaetano Mosea) কার্ল মার্ক্সের বিপরীত অভিমুখে গিয়ে এই ধারণা অপনোদন করার চেষ্টা করেছেন যে, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাঁর 'The Ruling Class' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি একথাই বলেছেন যে, সমাজে সবসময়েই একটি শাসকশ্রেণী থাকবে।

মসকার মতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয় সেই সকল সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজে যাদের ক্ষমতা থাকে। সংগঠন ও কাঠামোর জোরে এই ব্যক্তিবর্গ সমাজে আধিপত্য কায়েম করে বাস্তবে একটি সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই আধিপত্যশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্র থাকে—আত্মীয়তার যোগসূত্র, স্বার্থের যোগসূত্র, সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ইত্যাদি। এইসব যোগসূত্রের ফলে এদের মধ্যে একটি চিন্তাগত সাযুজ্য ও গোষ্ঠীগত একতা গড়ে ওঠে, যেগুলি সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ—যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও বলীয়ান—তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমরূপ নয়, বরং তারা স্তরবিন্যস্ত। এদের মধ্যে খুবই স্বল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি বা পরিবারের অস্তিত্ব থাকে যারা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক ক্ষমতাবান এবং তাদের পরিচালনা করে। এই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব দান করে যার ফলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আরও বলিয়ান হয়ে ওঠে। মসকার মতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত নেতাদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলেই ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব।

মসকা তাঁর 'The Ruling Class' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "সমস্ত সমাজে—যেসব সমাজ খুব অল্পই উন্নত এবং কোনমতে সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেগুলি থেকে শুরু করে সবথেকে অগ্রসর ও ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজগুলি অবধি—দুই শ্রেণীর ব্যক্তির দেখা মিলেছে—একটি শ্রেণী শাসন করে এবং একটি শ্রেণী শাসিত হয়। সবসময়েই স্বল্পসংখ্যাবিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীটি রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে; একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা অধিকার করে এবং ক্ষমতা যে সুবিধাগুলি আনয়ন করে সেগুলি ভোগ করে, যেখানে অধিক সংখ্যাবিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথমটির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এমনভাবে যা কখনও কখনও মোটামুটি আইনানুগ, কখনও কখনও মোটামুটি বিধিবহির্ভূত ও হিংস্র এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথমটিকে, অন্তত দৃষ্টিগোচরভাবে,

ভরণপোষণের বস্তুগত উপকরণসমূহ এবং রাজনৈতিক অবয়বের বৈধতার জন্য যেসব প্রকরণগুলি অপরিহার্য সেগুলি সরবরাহ করে।"

মসকা তাঁর ক্ষমতাশীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বে রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছার শাসন'-এর ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, "গণতন্ত্র হ'ল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।" গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাকে মসকা অস্বীকার করেছেন। মরিস দুভারজারের মতে মসকার তত্ত্বে যে শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা জনগণের শাসন হলেও এই শাসনব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জনগণের ভিতর থেকে উঠে আসে। পৃথিবীর সর্বত্রই যে কোনও দেশ বা জাতি শাসিত হয় রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা।

মসকার মতে, প্রজাতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের তীব্রতা ইত্যাদির উপরে নয়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক সমন্বিত সামাজিক কাঠামোর উপরেই নির্ভর করে যে একটি জনগোষ্ঠী শাসন করবে বা শাসিত হবে। তাঁর মতে, নিগ্রো ও ভারতীয়গণ নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রগতির যে স্তরে উপনীত হতে পারত তা ইউরোপীয় শাসনের দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। নিগ্রোরা যদি শ্বেতাঙ্গদের মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা লাভ করত, তা হলে তারা শ্বেতাঙ্গদের মতো উন্নতি করতে পারত না এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। নিগ্রো শিশুরা যখন উপলব্ধি করে যে, তারা নীচ হিসাবে বিবেচিত একটি প্রজাতির সন্তান এবং তারা পাচক ও মালবাহকের চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার আশা করতে পারে না, তখন তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে উন্নতির সব উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

মসকার মতে, সমাজে ডারউইন-কথিত বেঁচে থাকার লড়াই ততটা দেখা যায় না যতটা দেখা যায় বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম। এই প্রবণতাটি সমস্ত সমাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়। বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার সংগ্রাম বলতে মসকো বুঝিয়েছেন অর্থ, ক্ষমতা ও স¥œানের জন্য সামাজিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মতো এক্ষেত্রে পরাজিতদের নিহত বা নিশ্চিহ্ন করা হয় না। এক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু পরাজিতরা শুধুমাত্র কিছুটা কম পরিমাণে বৈষয়িক তৃপ্তি এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে।

মসকার মতে, একটি মৌলিক এবং অপ্রতিরোধনীয় মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম মানুষের স্বভাব গড়ে তোলে। সেটি হ'ল বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য মানুষের আকাঙ্খা এবং তজ্জনিত সংগ্রাম। এই আকাঙ্খাজনিত সংগ্রামের ফলে সমাজে অবধারিতভাবে শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি সমাজেই একটি শাসক ও শাসিতশ্রেণী ছিল, আছে বা থাকবে। মার্ক্স যেভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বদলের সাথে সাথে শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের কথা বলেন, তা মসকার কাছে একেবারেই গ্রহণীয় নয়। অবশ্য প্যারেটো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের যে পরিমাণে সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন তা মসকা কখনই বলেননি।

মসকার মতে, যখন সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হয় তখন শাসনতান্ত্রিক, সামরিক ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও নৈতিক নেতৃত্ব-সমন্বিত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সবসময়েই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা সংগঠিত সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কায়েম হয়। মসকা বিশ্বাস করতেন যে, গমতন্ত্রেও এই ধরনের সংগঠিত সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন থাকে। যদিও গণতান্ত্রিক বিধিবিধানসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণের আদর্শের কথাই বলে

এবং যদিও গমতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণই প্রদর্শিত হয়, তবুও এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই বাস্তবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হয়।

মসকা গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসনের সাথে অন্যান্য সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উন্মুক্ত বলে গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীও হল উন্মুক্ত। অর্থাৎ যেখানে শাসিতশ্রেণীর থেকেও যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের শাসকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। এখানে সংখ্যালঘু শাসকদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের আংশিক নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকতে পারে। গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের দ্বারা গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের উপর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব পরিপক্ষিত হয়। অপরদিকে, সামন্ততান্ত্রিক বা অন্য কোনও ধরনের আবদ্ধ সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীও আবদ্ধ হয়ে থাকে। উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করে মসকা বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন জনকল্যাণমুখী শাসন। কিন্তু এই শাসন জনগণের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। শাসনের প্রয়োজনে গণতন্ত্রেও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ববাদী (elitist) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে মসকা গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন সত্ত্বেও সীমিত ভোটাধিকারের কথা বলেছেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই ভোটাধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

মসকার মতে, গণ-অসন্তোষের ফলে একটি শাসকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্য থেকে এমন একটি শ্রেণীর উত্থান ঘটবে, যে শ্রেণীটি শাসকশ্রেণীর কার্য সম্পাদন করবে। অন্যথায় গোটা সামাজিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। সমাজের প্রাধান্যশীল শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার এবং বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতায় আসীন থাকার প্রবণতা লক্ষিত হয়। আবার আগের ক্ষমতাশালীদের অবসান এবং নতুন একটি শ্রেণীর ক্ষমতায় অভ্যুত্থানের প্রবণতাও লক্ষিত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বারংবার এই দুই প্রবণতার মধ্যে সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর একটি অংশের মধ্যে এই সংঘাতের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সম্পদের নতুন উৎসসমূহের বিকাশ, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, পুরাতন ধর্মের জায়গায় নতুন ধর্মের বিস্তার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। নতুন আবিষ্কার, বিদেশীদের সাথে বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রবাসন ও অভিবাসন প্রভৃতি সমাজে নতুনভাবে সম্পদ বা দারিদ্র্যর স্রষ্টাকার। এসবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব, নতুন নৈতিক চেতনার বিকাশ এবং নতুন বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটলে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী নতুন গুণগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে তখন নতুন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয়।

মসকা তাঁর তত্ত্বে অবর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (Sub-elite) সম্পর্কিত ধারণার অবতারণা করেছেন। এই অবর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয় সরকারি কর্মচারী, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, শিল্প-পরিচালকমণ্ডলী প্রভৃতিকে নিয়ে। এই

শ্রেণীটি একটি বিশিষ্ট সামাজিক শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শ্রেণীর অবস্থান হল রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ঠিক পরেই।

শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার উৎস হল তার সংগঠিত সংখ্যালঘুত্ব, যার ফলে এই শ্রেণী অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর আধিপত্য কায়েম করে। অসংগঠিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি সংখ্যালঘু শাসকবর্গের সংগঠিত শক্তির কাছে ক্ষমতাহীন প্রতিপন্ন হয়। একটি ছোট গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঐক্যবদ্ধ কর্মের সুযোগ বেশি থাকে। ফলত, এই সংখ্যালঘু শ্রেণী যা করতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তা কখনও করতে পারে না। মসকার মতে, একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের আয়তন যত বড় হয়, সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠীর আয়তন তুলনামূলকভাবে তত ছোট হয়। এক্ষেত্রে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সংগঠিত করা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের প্রকৃতি এমন যে জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের জনগণের সেবক থেকে প্রভূতে রূপান্তরিত করে ফেলে। নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নিজেদের সুসংগঠিত করে তুলে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য জনসাধারণের তুলনায় এদের বস্তুগত, বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীও উচ্চস্তরের হয়। সংগঠন ও উচ্চতর গুণাবলীর ফলে এরা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ধর্মীয়, নৈতিক ইত্যাদি সামাজিক শক্তিসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। সামরিক শক্তির বলে যুদ্ধপ্রবণ অভিজাতশ্রেণী সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ থেকে উৎপাদকদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সমেত সকল সমাজে দরিদ্রদের তুলনায় ধনীদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি। কোনও কোনও সমাজে নির্দিষ্ট কোনও সময়ে ধর্মীয় শক্তির অধিকার থেকে সম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে যাজকশ্রেণীর প্রভাবেই সমৃদ্ধি ও ক্ষমতালাভ ঘটেছিল, কোনও কোনও সমাজে আবার বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের ফলেও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার লাভ করা যেতে পারে। সংগঠন, উচ্চতর গুণাবলী এবং সামাজিক শক্তিসমূহের অধিকারের ফলে সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী এমন সুবিধা পায় যে আইনে না হলেও বাস্তবে এই শ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে শাসনের অধিকার কায়েম করে।

মসকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজাততন্ত্রেরও শাসকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, এদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বংশগত ততটা নয় যতটা তাদের বিশেষ ধরনের লালনপালন; যার ফলে এদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণে কিছু বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটেছে।

যদিও এই সংগঠিত সংখ্যালঘুদের শক্তি জনসাধারণের চেয়ে বেশি, তবুও তারা অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রতিরোধকামী জনগণের বিরুদ্ধে এই শক্তির প্রয়োগ করে না। সাধারণত শাসকশ্রেণী একটি "রাজনৈতিক সূত্র" ('political formula') প্রয়োগের দ্বারা তাদের শাসনকে জনগণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে। এই রাজনৈতিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও অভ্যাসসমূহ যেগুলি ঐতিহাসিকভাবে একটি জাতির মধ্যে গড়ে ওঠে। এগুলির উপর নির্ভর করে শাসকশ্রেণী যেসকল মোহ ও বিভ্রান্তির সঞ্চার করে, সেগুলিই এই শাসকশ্রেণীর শাসনকে জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তুলে তাকে বৈধতা প্রদান করে। প্রাচীনকালে রাজার শাসনের ঐশ্বরিক অধিকার ছিল এরকম একটি রাজনৈতিক সূত্র। বর্তমান যুগে জাতীয়তাবাদ

হল রাজনৈতিক সূত্রের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। একটি শাসনতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নিম্নশ্রেণীর জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সূত্র উদ্ভাবনের উপর। সমাজের অধিক জনসংখ্যাবহুল ও স্বল্পশিক্ষিত স্তরের চেতনায় রাজনৈতিক সূত্রের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি প্রোথিত থাকা প্রয়োজন। একমাত্র তখনই শাসকশ্রেণী দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী হলেও দরিদ্র, শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের আনুগত্যলাভে সক্ষম হয়। কিন্তু মসকা এই সম্ভাবনা কখনও খতিয়ে দেখেননি যে, জনগণের চেতনার মান উন্নত করলে তারা তাদের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক সূত্রকে নাকচ করতে পারে কিনা।

মসকা বলেছেন যে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটি 'পরিচালক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী' গড়ে ওঠে যারা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরোধী এবং যারা জনসাধারণের উপর সরকারের তুলনায় বেশি প্রভাবশালী। যখন উচ্চশ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রবণতা কমে নমনীয় স্বভাবের আধিক্য ঘটে এবং নিম্নশ্রেণীর প্রত্যাশী ব্যক্তিদের কাছে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন নিম্নশ্রেণীর থেকে উঠে আসা শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ উচ্চশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটায়। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে জীবনের কঠোর প্রয়োজন, নিত্যদিনের জীবনসংগ্রাম, সুশিক্ষিত সংস্কৃতির অভাব ইত্যাদির ফলে মানবপ্রকৃতির কুলিশকঠোর ভাবটি সদাজাগ্রত থাকে। মসকার তত্ত্বের এই অংশটি প্যারেটোর তত্ত্বের অনুরূপ। অতএব, প্যারেটো ও মসকা উভয়ের মধ্যেই মেহনতী জনতা সম্ভবন্ধে একটি মুগ্ধতা ছিল যদিও তা মার্ক্সীয় ভাবধারার থেকে একেবারেই আলাদা।

মসকার মতে, একটি শাসকশ্রেণীর ভাগ্য নির্ভর করে তার উদ্যম, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধির উপর। কোনও-না-কোনও ধরনের শাসকশ্রেণী সদাই সমাজে বিরাজ করবে; তা বিলোপের প্রচেষ্টা অর্থহীন। এই উপলব্ধি নিয়ে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বাবস্থা গড়ে তোলাই হল আসল কাজ।

মিশেল্‌সের মতে সংগঠনমাত্রেই মুষ্টিমেয় শাসক বা গোষ্ঠীতন্ত্রের অনমনীয় বিধি বা লৌহবিধির ("the iron law of oligarchy") দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchical tendencies of Modern democracy'। এই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন, "যে সংগঠনের কথা বলে সে আসলে গোষ্ঠীতন্ত্রের কথা বলে" ("who says organization says oligarchy")।

তাঁর পূর্বসূরী প্যারেটো ও মসকার মতোই মিশেল্‌স্ মার্ক্সের বিপরীত অভিমুখে গিয়ে মানবীয় প্রকৃতির এক ক্ষমতাকামী ধারণার উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীতন্ত্রের আবির্ভাবের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে সংগঠনের যে প্রয়োজন দেখা দেয় তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে গোষ্ঠীতন্ত্রের জন্ম হয়। কারণ মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা হল ক্ষমতা কামনা করা এবং একবার ক্ষমতা অধিকার করতে পারলে তা চিরস্থায়ী করা।

জনতার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে মিশেল্‌স্ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জনগণ নিজেদের শাসন করতে অসমর্থ। তিনি বলেছেন যে, একটি ক্ষুদ্র জনতার তুলনায় একটি বৃহৎ জনতার উপর আধিপত্য বিস্তার করা

সহজ। জনতাকে সহজেই অযৌক্তিকভাবে অভিভাবিত ও প্রভাবিত করা যায়। জনতা কোনও গভীর আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত প্রদানে অপারগ। দ্বিতীয়ত এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল গণতন্ত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির অংশগ্রহণের সমস্যা। গণতন্ত্র বলতে যদি বোঝায় যে, বিশালসংখ্যক জনসাধারণ একত্রে এবং প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে, তাহলে গণতন্ত্র অসম্ভব হয়ে পড়ে। জাতীয় রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের এই সীমাবদ্ধতা আধুনিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সকল ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দলগুলি নিয়ে মিশেল্‌স্‌ পর্যালোচনা করেছিলেন, সেগুলির বিশাল আয়তনের ফলে সদস্যদের সরাসরি আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ অসম্ভব বলে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন, তৎকালীন বার্লিনের সমাজতান্ত্রিক দলটিরই সদস্যসংখ্যা ছিল নব্বই হাজারের উপর। আধুনিক দীলয় সংগঠনগুলি বৃহদায়তন বিশিষ্ট হওয়ায় শ্রমবিভাগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এগুলির আয়তন যত বৃদ্ধি পায় ততই নতুন কার্যাবলীর উদ্ভব ঘটে ও জটিলতা দেখা দেয়। অতএব, কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের নির্দেশিকা অনুসারে কাজ করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত দলীয় সংগঠনগুলির উদ্ভবের প্রথম স্তরে—যখন সেগুলির আয়তন ছোট থাকে—বিভিন্ন দলীয় পদের সাথে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থের ও ক্ষমতার কোনও সংশ্রব থাকে না। কিন্তু যখনই সংগঠন আয়তনে বৃদ্ধি পায় তখনই দলীয় পদগুলি অর্থ ও ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে। এছাড়াও, শ্রমবিভাগের ফলে কতকগুলি বিশেষ দলীয় কর্মের জন্য দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে দলীয় পদাধিকারী হিসাবে কর্মরত একদল পেশাদার রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটে। এরা সংগঠনের সেবক না থেকে প্রভু হয়ে পড়ে এবং সংগঠন আরও উচ্চাবচ্চভাবে বিন্যস্ত ও আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং নিজেদের হাতে প্রচুর সুযোগসুবিধা জড়ো করে। এদের স্বার্থ সাধারণের স্বার্থের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে, এই নেতৃবৃন্দ অপরিহার্য। প্রতিটি দল অথবা শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠন স্বল্পসংখ্যক পরিচালক ও বিপুলসংখ্যক পরিচালিততে বিভক্ত হয়ে যায়। সংগঠনের গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী নীতির প্রতিকূলে শাসক ও শাসিতদের উদ্ভব ঘটে।

মিশেল্‌স্‌ বলেছেন যে, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সবচেয়ে চরম মতাবল¥¤Ï শাখাগুলি এই গোষ্ঠীতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার কোনও বিরোধিতা করে না। এক্ষেত্রে যুক্তিটা এই হয় যে, দলীয় গণতন্ত্র শুধু একটি আকৃতিগত বিষয় (form) মাত্র। যেখানে গণতন্ত্রের সাথে সংগঠনের বিরোধ বাধে যেখানে সংগঠনের স্বার্থে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়। সংগঠনই হল সমাজতন্ত্র অর্জনের উপায় এবং ফলত সংগঠনের মধ্যেই দলের বৈপ্লবিক সারবত্তা নিহিত থাকে। সংগঠন বা আধেয়কে গণতন্ত্র বা আধারের স্বার্থে বিসর্জন দেওয়া যায় না। আরও বলা হয় যে, সংগ্রাম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সদস্যদের শেখানো হয় যে, নিয়মানুবর্তিতাই হল শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য এবং এজন্য নিষ্ঠার সাথে উপরিস্থিত নেতাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা কর্তব্য।

জনসাধারণ উদ্যোগগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়। মিশেল্‌স্‌ একে 'জনগণের চিরস্থায়ী অক্ষমতা' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিষয়গুলি সাধারণ সদস্যদের বোধগম্য নয় বলে তারা এসব ব্যাপারে ততটা আগ্রহ বোধ করে না। মিশেল্‌সের মতে, দলের সাধারণ সভাগুলিতে উপস্থিতির স্বল্পতা

থেকেই এদের উদাসীনতার বিষয়টি বোঝা যায়। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও জনগণের আরও কতকগুলি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির ফলে তাদের অক্ষমতা এবং নেতৃত্বের সক্ষমতা দুইই বৃদ্ধি পায়। মিশেল্‌স্ সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক ও কমচারী সংগঠনসমূহের অধিকাংশ সদস্যের বয়স হল ২৫ থেকে ৩৯ বছর। যুবকদের অবসর কাটানোর আরও অনেক উপায় আছে। এছাড়াও তারা কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে যে, কোনও অলৌকিক উপায়ে, অর্থাৎ বাইরের কোনও শক্তির হস্তক্ষেপে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং সারা জীবন তাদের শ্রমিক হিসাবে কাটাতে হবে না। ফলে তারা শ্রমিক সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়ে। বয়স্করা আবার শ্রমিক সংগঠনগুলির সংগ্রামী ভূমিকার ও সাফল্যের ব্যাপার নির্মোহ হয়ে সদস্যপদ ত্যাগ করে। অতএব, নেতৃবৃন্দ সদস্যদের তুলনায় সাধারণত বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে প্রবীণ হয়। যুবক সদস্যদের অগভীর সমালোচনা তাদের ভীতি উদ্রেকের কোনও কারণ ঘটায় না।

আরও অনেক কারণে সাধারণ সদস্যদের সাথে নেতাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ দেশেই দলীয় নেতারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসে এবং ফলত শুরুতেই তারা সাধারণ সদস্যদের তুলনায় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে উন্নততর হয়। এমনকি জার্মানীর মতো যেসব দেশে নেতৃত্বের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানেও শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে। সাধারণ সদস্যরা দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে এতটাই ব্যাপৃত থাকে যে, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন তাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন নেতা শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হলেও আর্থিক দৈন্য থেকে মুক্তিলাভ করে জনজীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ফলত তিনি সাধারণ সদস্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। সাধারণ সদস্যদের নানা কারণ ঘটিত অক্ষমতা ও নেতৃবৃন্দের বিশেষজ্ঞতা ও উৎকর্ষের জন্যই দলে গণতন্ত্র বিনষ্ট হয় ও গোষ্ঠীতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

মিশেল্‌সের মতে, সংগঠনের আসল কর্তৃত্ব 'বৈতনিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত আমলাবৃন্দে'র ('hierarchy of salaried officialdom') হাতে ন্যস্ত থাকে। এখানে মার্ক্সের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার। মার্ক্সের মতে, সম্পত্তির মালিকানা হল কর্তৃত্বের উৎস। অপরদিকে, মিশেল্‌স কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে সাংগঠনিক আমলাতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে ভোটদাতাদের সমর্থন লাভের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হয়। এজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে প্রচার চালাতে হয়। দলীয় প্রচারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়। এছাড়াও দল চালনার জন্য দলের আইনগত অবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়ার দরকার হয়। দলের মধ্যে সংহতি রক্ষা ও সুসমঞ্জস পরিচালন ব্যবস্থার স্বার্থে সুসংহত দলীয় নীতি নির্ধারণও কার্যকর করতে হয়। এই সকল ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। এ সকল দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অবকাশ সাধারণ সদস্যদের থাকে না। নেতারাই দলের গণসংযোগ করা ও দলীয় তহবিল সমৃদ্ধ করার বিষয়গুলি তদারক করেন। সংসদীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাই ও অন্যান্য দলীয় আনুকূল্য প্রদানের ব্যাপারে শীর্ষ নেতারাই নির্ধারক ভূমিকা পালন করেন। দলের নির্বাচনী সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য দলের সদস্য-সমর্থন ছাড়াও অন্যান্যদের সমর্থন

সংগ্রহের কাজে নেতারাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমসমূহ দলীয় নেতাদের কথাবার্তা ও কার্যসমূহকে গুরুত্বদানপূর্বক ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এই সব কিছুর সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে দলীয় নেতাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয় এবং তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

নেতাদের এই উত্তরোত্তর অসঙ্গতভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক দুর্নীতি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যরা অবশ্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ অনেক সময়ই ব্যর্থ হয় উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে। এছাড়াও সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অগ্রণী কিছু ব্যক্তির প্ররোচনাতেই সাধারণত বিদ্রোহ করে। এই অগ্রণী ব্যক্তিদের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ সহজেই প্রলুব্ধ করে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। আর কখনও যদি এই বিদ্রোহ সফলও হয়, তখন ঐ অগ্রণী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা ক্ষমতাসীন হয়ে আগের নেতাদের মতোই আচরণ করতে থাকে। সাধারণের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলেও সাধারণ সদস্যদের অধিকার রক্ষিত হয় না বরং এর ফলে দলের মধ্যে একটি বিশাল গোষ্ঠীতন্ত্রের বদলে সেই ছোট গোষ্ঠীতন্ত্র গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীতন্ত্র নিজস্ব অধিকারভুক্ত বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে মাঝারি সারির নেতারা কেন্দ্রীয় সকল নেতৃবৃন্দের আগ্রাসী কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

তবে মিশেল্‌সের তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এর কারণ হল যে তিনি নেতৃবৃন্দ ও মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকদের (oligarchs) মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্যনির্দেশ করেননি। সমাজে সবসময়েই নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন আছে তা দেখাতে গিয়ে তিনি কিন্তু নেতাদের সাথে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকদের গুলিয়ে ফেলেছেন। কীভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হয় তাও তিনি দেখাননি। তিনি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহারের কথা বলেছেন যার ফলে জনপ্রতিনিধিরা পরবর্তী কালে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। কিন্তু বাস্তবে এটা সবসময়েই ঘটেছে কিনা তার যাচাইয়ের মাধ্যমেই এই প্রকল্পটির সত্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু মিশেল্‌স্ তা করেননি। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মিশেল্‌সের তত্ত্ব রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং তাঁর পূর্বসূরী প্যারেটো ও মসকার তত্ত্বের যুক্তিস¥œত পরিণতি।

১। প্যারেটো কাদের ‘শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ’ (‘elites’) বলেছেন?

২। ‘শৃগাল’ ও ‘সিংহ’ বলতে প্যারোটো কী বুঝিয়েছেন?

৩। প্যারেটোর মতে কোন্ অবস্থায় শাসকগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারী ও নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের মধ্যে প্যারেটো কীভাবে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন?

৫। প্যারেটো তত্ত্বর কী ধরনের সমালোচনা করা হয় থাকে?

৬। সমাজে আধিপত্যশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ স¥œন্ধে মসকা কী বলেছেন?

৭। মসকা সমাজে কোন্ দু’টি শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা বলেছেন?

৮। গণতন্ত্রের ধারণার সাথে মসকার তত্ত্ব কতটা সঙ্গতীপূর্ণ?

৯। একটি জনগোষ্ঠী শাসন করবে না শাসিত হবে—তা কীসের দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে মসকা মনে করতেন?

১০। 'বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম' বলতে মসকা কী বুঝিয়েছেন?

১১। কীভাবে শাসকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং নতুন শাসককুল ক্ষমতায় আসীন হয় বলে মসকা মনে করতেন?

১২। অবর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ স¥¤ন্ধে মসকা কী বলেছেন?

১৩। সংগঠিত সংখ্যালঘুত্বের ফলে শাসকশ্রেণী অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তুলনার কী সুবিধা ভোগ করে বলে মসকা মনে করতেন?

১৪। সংগঠন ছাড়া আর কোন্ কোন্ কারণে সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে বলে মসকা অভিমত প্রকাশ করেছেন?

১৫। কীভাবে মসকার মতে শাসকশ্রেণী তাদের শাসনকে শাসিতদের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে?

১৬। নিম্নশ্রেণীর নেতারা কখন ও কীভাবে উচ্চশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটাতে পারে বলে মসকা মনে করতেন?

১৭। 'গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধির শাসন' বলতে মিশেল্স্ কী বুঝিয়েছেন?

১৮। কেন জনগণ নিজেদের শাসন করতে অসমর্থ বলে মিশেল্স্ মনে করতেন?

১৯। মিশেল্সের মতে দলীয় সংগঠনে কীভাবে নেতৃবৃন্দের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়?

২০। দলীয় সাধারণ সদস্যদের অক্ষমতার কী কী কারণ মিশেল্স্ নির্দেশ করেছেন?

২১। কীভাবে মিশেল্সের মতে দলীয় নেতাদের সাথে সাধারণ সদস্যদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়?

২২। দলীয় নেতারা কী কী কাজের মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের তুলনায় সুদৃঢ় অবস্থান লাভ করে এবং আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ও কর্তৃত্বশালী হয় বলে মিশেল্স্ মনে করতেন?

২৩। দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যদের বিদ্রোহের কী ফল হয় বলে মিশেল্স্ নির্দেশ করেছেন?

২৪। দলীয় সংগঠনে বিকেন্দ্রীকরণের কী ফল মিশেল্স্ নির্দেশ করেছেন?

২৫। মিশেল্সের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কোথায়?

১। Irving, M. Zeitlin : *Ideology and the Development of Sociological Theory.* (New Delhi : Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. 1969)

২। Guy, Rocher : *A General Introduction to Sociology : A Theoretical Perspective.* (London : The Macmillan Press Ltd., 1972)

৩। Lewis, A. Coser : *Masters of Sociological Thought.* (Jaipur : Rawat Publications, 1996)

□

২১.০ উদ্দেশ্য

২১.১ প্রস্তাবনা

২১.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

২১.২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য

২১.৩ রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি

২১.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

২১.৪.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ

২১.৪.২ মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও তার প্রকারভেদ

২১.৫ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকসমূহ

২১.৫.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান

২১.৫.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক

২১.৬ রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

২১.৭ সারাংশ

২১.৮ অনুশীলনী

২১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা এবং তার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥¤ন্ধে বিভিন্ন লেখকের ধারণা
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির কিছু বিশেষত্ব?
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক (dimension), রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ (classification), মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং তার প্রকারভেদ (types)
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি, রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

প্রস্তাবনা

বৈধতা অর্জনের জন্য যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সেই কর্তৃত্বের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও ইতিবাচক সমর্থনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশ প্রয়োজন। কোনও কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, কোথাও কোথাও আবার এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দেখা যায়। তাই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নাগরিকেরা কোথাও নিঃশর্তে সমর্থন করেন ও প্রয়োজনীয় আনুগত্য দেখান। কোথাও আবার নাগরিকেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। এর থেকে আপনারা সহজেই বুঝবেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র জানার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসৃত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

আগের অনেক লেখক জাতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে চলে তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁরা সকলেই সেই জাতির সদস্যদের বিশ্বাস, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের রাজনীতিচর্চা ও মন্টেস্কু, টকভিল ও বেজহটের লেখার উল্লেখ করা যায় তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিংশ শতকেই শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে গ্যাব্রিয়েল এ. অ্যালমন্ড সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহার করেন।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

অ্যালান বল মনে করেন যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটির কোনও প্রকৃত সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক সংস্কৃতির যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আপনাদের জানাই।

গ্যাব্রিয়েল এ অ্যালমন্ড ও জি. বিংঘাম পাওয়েলের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার ধরন। অ্যালান বল মনে করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস, ভাবাবেগ ও মূল্যবোধকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। সিডনি ভার্বা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস, সুস্পষ্ট প্রতীক ও মূল্যবোধের ধারক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি যে পরিবেশে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করে, তার স¥¤ন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেয়। লুসিয়ান পাইয়ের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টি যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অর্থবহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে। বুবলাটস্কি মনে করেন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, সামাজিক স্তর ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের জ্ঞান ও অনুভূতির ধরন এবং তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার তারতম্য।

২১.২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥¤

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রিয়াকলাপকেন্দ্রিক নয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসকে বোঝায়। রাজনীতির জগতে কী ঘটছে তার বদলে সেই ঘটনাবলী স¥¤ন্ধে জনগণের কী দৃষ্টিভঙ্গী ও তার আলোচনাই হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন রকমের হতে পারে; বাস্তব রাজনৈতিক জীবন স¥¤ন্ধে

অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা বা বিশ্বাস হতে পারে, রাজনৈতিক জীবনে অনুসরণযোগ্য লক্ষ্য বা মূল্যবোধসংক্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস হতে পারে। এগুলি আবেগমূলকও হতে পারে, উপলব্ধিমূলকও হতে পারে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি সচেতনভাবে অনুভূত নাও হতে পারে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আওতার বাইরে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্ট হয়। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, যা পুরোপুরি সরকার-নিয়ন্ত্রিত ও স্থিরীকৃত ব্যবস্থায় রাখা যায় না।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রাজনীতির মনস্তত্ত্বমূলক মাত্রা বলা যায়। এটির একটি বিষয়ীগত পরিধি আছে, যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে অর্থবহ ও সুদৃঢ় করে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যকরী ধারা উভয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক সংস্কৃতি উদ্দেশ্যহীন নয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারার প্রতিফলন, যে ধারা সুবিন্যস্ত এবং যার বিভিন্ন দিক পরস্পরকে শক্তিশালী করে।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না। রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥প্রন্ধে সচেতনতাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট করে তোলে। এ প্রসঙ্গে অ্যালান বল ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে লর্ডসভা ও রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক দিক থেকে উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষরা যে উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের এবং লর্ডসভা ও রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম অংশ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একই ধরনের মনোভাব কাজ করে, তবে সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে মতৈক্য দুর্বল, সেখানে বিশৃঙ্খলা বা বিপ্লব ঘটতে পারে। মতৈক্য সামাজিক উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয় এবং সেই উদ্দেশ্য অভিমুখে পৌঁছানোর পদ্ধতি—এই দুই বিষয়েই থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোনও বিপ্লবকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক মতৈক্যের অনুপস্থিতির জন্য। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এখন যে অস্থিরতা দেখা যায়, তার মূলে আছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥প্রন্ধে মতৈক্যের অনুপস্থিতি।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকে না। সমাজের সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও অবিরত পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে। বসবাসের জন্য বহির্দেশীয়দের ব্যাপকহারে আগমন, বিপ্লব, যুদ্ধ, যুদ্ধে পরাজয় বা অন্য কোনও রকমের বৃহৎ পরিবর্তনের ফলে কোনও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে পারে। তার ফলে রাষ্ট্রের সরকার ও নীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বা বলশেভিক বিপ্লবের পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল। যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিজিত রাষ্ট্রের ওপর বিজয়ী রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দেশগুলিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব চালান করার চেষ্টা করেছে। ফলে, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মার্কিন প্রভাব কিছু পরিবর্তনের সূচনা করেছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে

নতুন মূল্যবোধ বা মনোভাবের সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনও অবশিষ্ট ব্যাখামূলক প্রকৃতিযুক্ত (Residual Explanator Category) নয়। এর মধ্যে যে ঘটনাবলীর কথা বলা হয় সেগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং অনেকাংশে তাদের পরিমাপও করা যায়। জনমত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সমীক্ষা হল প্রাথমিক ধাপ, যার সাহায্যে বড় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যক্তিগত ঘটনা স¥ন্ধে পরিসংখ্যান দিতে পারে। সরকারি বক্তব্য, বক্তৃতা, লেখা, অতিকথা (Myth) ও লৌকিক উপাখ্যান (Legend) রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারার প্রকৃতি স¥ন্ধে জানতে সাহায্য করে। তাছাড়াও রাজনৈতিক আচরণ থেকেও রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী জানা যায়।

তবে জনমত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সমীক্ষা, সরকারি বক্তব্য, রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদি থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্ধারণে নানা সমস্যাও দেখতে পাওয়া যায়। জনগণ তাদের প্রতিক্রিয়া অনেক সময় লুকিয়ে রাখে। যোগাযোগ ও ব্যাখ্যাসংক্রান্ত সমস্যাও গভীর। রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের উপাদান সংযুক্ত। তাদের পৃথক করা খুবই কঠিন। তবুও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের প্রচেষ্টা অবশ্যই করা উচিত, কারণ তা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে চারজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা লিখুন।
(৪ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি

অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভাষাগত পার্থক্য, আঞ্চলিক গোষ্ঠীগত মনোভাব, শিক্ষার স্তর, জাতিগত সদস্যপদ, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধগত পার্থক্য থাকে। তাই অ্যালান বল বলেছেন যে, স্থিতিশীল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় নয়। যেখানে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য খুবই প্রকট, সেখানে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। যখন কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ধরন অন্যদের থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়, তখন তাকে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি বলে। অ্যালমন্ড এবং পাওয়েলের মতে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট এক ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথকভাবে প্রতীয়মান হলে তাকে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। অ্যালান বলের অভিমত অনুসারে, উপসংস্কৃতি বলতে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধরনকে বোঝায় না; এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝায়, যার কিছু কিছু অন্যান্য উপসংস্কৃতির সঙ্গে সমজাতীয়। অর্থাৎ কিছু কিছু আবার সমজাতীয় নয়। ফরাসী কানাডীয়রা উপসংস্কৃতির একটি উদাহরণ। তারা মনে করে

যে, কানাডার প্রতি সামগ্রিক আনুগত্যের থেকে তাদের গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গী খুবই প্রবল হওয়ায় কুইবেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন খুবই শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির উদাহরণ।

যে কোনও দেশের রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি স¥ন্ধে ধারণা ছাড়া সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক বিকাশশীল দেশে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির সমস্যা খুবই প্রবল। অঞ্চল, ধর্ম, সামাজিক শ্রেণী, জাতি, ভাষা, প্রজন্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সেখানে নানা ধরনের উপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষেও জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে উপসংস্কৃতিগত পার্থক্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ দিক। শিখ উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ বা বিভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠীগত বা আঞ্চলিক মনোভাব ও আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিবিধির অনুধাবনের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যবহ।

সাধারণত উপসংস্কৃতি সমাজের প্রধান কাঠামোগত ব্যবস্থাকে বাধা দেয় না। কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে পৃথক ধারণা করে। এর ফলে সাধারণত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালকদের কোনও অসুবিধা হয় না। তারা মূল্যের পুর্নবণ্টনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করতে পারে। কিন্তু যদি উপসংস্কৃতি মূল কাঠামোগত ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করে, তাহলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। তখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলপ্রয়োগ দ্বারা অবস্থা আয়ত্বে আনতে বাধ্য হয়। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা ও উত্তেজনা দেখা দেয়। ভারতে ভাষাগত বা আঞ্চলিক বিভিন্ন অপসংস্কৃতিগত গোষ্ঠী মাঝে মাঝে এরূপ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আবার কোথাও কোথাও প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কোনও জাতিগোষ্ঠীর উপসংস্কৃতি। যেমন, ইথিয়োপিয়ায় প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল সেখানকার একটি বিশেষ গোষ্ঠী আমহারাটেদের উপসংস্কৃতি।

২

১। রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনারা উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক (Dimensions)

আপনারা আগেই দেখেছেন যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কিছু দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা, যা একটি সমাজের জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুভব করে। অ্যালমন্ড এবং পাওয়েলের মতে, এই মানসিকতার তিনটি দিক (Dimensions) আছে ঃ-

(১) জ্ঞান বা ধারণাসংক্রান্ত দিক (Cognitive Orientations)—এর অর্থ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস সংক্রান্ত নির্ভুল ধারণা বা জ্ঞান। একজন ব্যক্তির সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকলাপ, যেমন তাঁরা কী ধরনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেন, সরকারি নীতি কী ধরনের বা সমসাময়িক সমস্যাগুলি কী কী, এ সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান বা ধারণা থাকতে পারে। এই জ্ঞান বা ধারণা হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রথম দিক।

(২) প্রভাবী দিক (Affective Orientation)—এর অর্থ হল রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুভূতি, যেমন রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা একাত্মবোধ করা বা রাজনৈতিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা। ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানের অনুভূতি হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির দ্বিতীয় দিক।

(৩) মূল্যায়নমূলক দিক (Evaluative Orientation)—এর অর্থ হল রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে বিচার বা মতামত, অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষয় বা ঘটনার মূল্যমান বিচার বা মূল্যায়ন। যে কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে বিচার করে সে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে রাজনৈতিক চাহিদার প্রতি যথোপযুক্ত দায়িত্বশীল মনে না করতে পারে। তার নৈতিক বিচার অনুসারে সে সরকারি অসাধুতা বা স্বজনপ্রীতির নিন্দা করতে পারে। এই বিচার হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির তৃতীয় দিক।

যে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর ব্যক্তিগত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গীকে এই তিনটি দিকের ভিত্তিতে বিচার করা যায়। তিন ধরনের দিকই আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একই ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের বিচারের ক্ষেত্রে তিনটি দিক নানাভাবে মিশ্রিত হতে পারে। জনগণের মধ্যে বিভিন্নভাবে বর্তমান এই দিকগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যপ্রণালীকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চাহিদা, সমর্থনের জন্য ব্যবস্থা, আইনের মান্যতা, ব্যক্তির ব্যবহার ও রাজনৈতিক ব্যবহারের ধরন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক ঘটনার পূর্বসংকেত প্রদানের ক্ষেত্রেও এই তিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত এই তিনটি দিক যে কোনও রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত হতে পারে যেমন—

(ক) সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা—জনগণের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥ন্ধে জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যায়ন থাকে এবং এগুলি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিকাশে সাহায্য করে। এজন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার দৈহিক সদস্যপদই যথেষ্ট নয়, মানসিকভাবেও সদস্য হওয়া প্রয়োজন।

(খ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ—উপাদান প্রক্রিয়া (Input-Output Process) স¥ন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের চাহিদাগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবাহিত হয়ে কর্তৃত্বমূলক নীতিতে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, গণমাধ্যম ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) আমলা, বিচারব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, ভূমিকা এবং ঐ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স¥ন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যায়ন থাকে, কারণ এদের কাজ হল কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা।

(ঘ) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অভিনেতা (Political Actor) হিসাবে ব্যক্তির নিজের ভূমিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা স¥ন্ধেও ব্যক্তির জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার প্রযুক্তি হয়।

(ঙ) বিশেষ রাজনৈতিক নীতি ও প্রশ্ন স¥ন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার থাকে।

৩

১। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তিন ধরনের দিক কী কী? এগুলির গুরুত্ব আছে কী?

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২১.৪.১

এই পাঁচ ধরনের রাজনৈতিক বিষয় স¥ন্ধে তিন ধরনের দিক বিচার করে সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জানতে পারা যায়। এই দিকগুলির প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে পৃথক হয়। তাই

রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সবদেশে এক হয় না। সমাজের সদস্যরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কিনা, সরকারি ক্রিয়াকলাপ থেকে উপকার আশা করে কিনা, সরকারের সঙ্গে একাত্মবোধ করে কিনা, অথবা সমাজে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় কিনা, জনগণ সরকারি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ আশা করে কিনা বা সরকারি কার্যকলাপ স¥¤ন্ধে জানতে পারে কিনা—এই প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। অর্থাৎ, উপকরণ-উৎপাদান প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর বণ্টন, রাজনৈতিক বিষয়গুলির সম্পর্কে অবহিত থাকা বা না থাকা এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে রাজনৈতিক বিষয়গুলির গুরুত্বের ভিত্তিতে যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিহ্নিতকরণ ও বৈশিষ্ট্যকরণ (Characterisation) করা যায়। অ্যালমন্ড ও ভার্বা তিন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন। যথা—

(১) অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Participatory Political Culture)—এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে, উপকরণ কাঠামো ও প্রক্রিয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন অনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করার অধিকার ভোগ করে। অর্থাৎ, এখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ব্যবস্থা, উপকরণ-উৎপাদন কাঠামো ও ব্যক্তির রাজনৈতিক ভূমিকা সংক্রান্ত ধারণাগত, প্রভাবী ও মূল্যায়ন মূলক দিকগুলি খুবই উচ্চমানের। উদাহরণ হল ব্রিটেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

(২) অধীনস্থ বা শাসিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Political Culture)—এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তির ইতিবাচক মনোভাব থাকে এবং ব্যবস্থার উৎপাদন (Output) যেমন, কল্যাণকর আইনব্যবস্থা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি তাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তাও বুঝতে পারে, কিন্তু তারা উপকরণ (Input) কাঠামোতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। উপকরণ কাঠামোতে ধারণাগত, প্রভাবী ও মূল্যায়নমূলক ভূমিকা না থাকায় জনগণ শাসকগোষ্ঠীর ও আমলাদের নির্দেশ মেনে চলে ও সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তারা বাস্তব সত্য হিসাবে মেনে নেয়, তাকে পরিবর্তনের ক্ষমতা তাদের থাকে না। রাজনৈতিক অভিনেতা (Actor) হিসাবে নিজের স¥¤ন্ধে কোন ধারণা থাকে না। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। সে এই ব্যবস্থাকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না এবং ব্যবস্থার কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে না। সে মনে করে যে, তার ভূমিকা হল ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা, পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা নয়। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং বিংশ শতকে স্বাধীন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখা যায়।

(৩) সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Political Culture)—এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে জনগণের সামান্য কোনও জ্ঞান বা ধারণা (Cognition) থাকে না। সুতরাং, প্রভাবী বা মূল্যায়নের (Affective and Evaluative) প্রচেষ্টাও থাকে না। ব্যক্তি তার প্রয়োজনের সময় শুধুমাত্র নিজ পরিবার, জনসম্প্রদায় বা নিজ প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স¥¤ন্ধে উদাসীন থাকে। এই জাতীয় জনগণ আধুনিক পশ্চিমী সমাজে দেখা যায় না। বস্তুত আধুনিক সমাজেই তারা দুষ্প্রাপ্য। কোনও কোনও পরিবর্তনশীল (Transitional) সমাজের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতিযুক্ত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গোষ্ঠী পাওয়া যেতে পারে, যারা জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত নয়। উদাহরণ হল ভারতের সাবেকী গ্রাম্যসমাজ। এখানে এমন ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া যেতে পারে, যারা ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ। দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র গ্রামীণ পুরোহিত বা আঞ্চলিক নেতাদের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে--যারা একই সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে ভাগ করা যায়। কিন্তু এগুলি হল আদর্শ ধরন—কোথাও অবিকৃতভাবে এগুলির অস্তিত্ব দেখা যায় না। নাগরিকরা কোথাও একভাবে আচরণ করে না। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোথাও সমসত্ববিশিষ্ট বা সমজাতীয় (Homogeneous) নয়। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু নাগরিক থাকতে পারে, যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। আবার কিছু নির্লিপ্ত নাগরিকও সেখানে দেখা যেতে পারে। বহু ব্যক্তি সরকারি নিয়ম বিনা প্রতিবাদে মেনে চলে, অনেকে আবার তার সমালোচনায় মুখর থাকে। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে যারা অধীনস্থ বা শাসিত মনোভাবযুক্ত, অর্থাৎ প্রায় সব সমাজেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিশ্র আকারের।

তিনটি শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে রবার্ট স্কট ১৯১০ ও ১৯৬০-এ মেক্সিকোর রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আলোচনা করেছেন। ১৯১০-এ মেক্সিকোর অধিবাসীদের ৯০% ছিল সংকীর্ণ (Parochial) ৯% অধীনস্থ (Subject) এবং ১% অংশগ্রহণকারী (Participant) । ১৯৬০-এ এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ২৫%, ৬৫% এবং ১০%।

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের গুরুত্বের তারতম্য থেকে সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত পরিবেশ ঠিকমত বোঝা যায়। এই তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন একত্রিতকরণ অনুসারে রাজনৈতিক কাঠামোকে পুনরায় শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তাই অ্যালমন্ড ও ভার্বা চার ধরনের মিশ্র বা মিশ্রিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলেন।

(১) সংকীর্ণ অধীনস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Subject Political Culture)—এখানে ব্যক্তি সরকারি ভূমিকার বিভিন্ন ধরন স¥¤ন্ধে ওয়াকিবহাল, কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে কীভাবে সে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে সে স¥¤ন্ধে অজ্ঞ। তা ছাড়াও রাজনৈতিক অভিনেতা (Actor) হিসাবে নিজের স¥¤ন্ধে তার ধারণাও খুবই অস্পষ্ট ও অবিকশিত। উপকরণ (Input) কাঠামোকে ভালোভাবে বোঝানো হয় না।

(২) অধীনস্থ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Participant Political Culture)—এখানে কোনও কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিকভাবে খুবই সচেতন ও সক্রিয়, কিন্তু বাকিরা নিষ্ক্রিয়। প্রথমোক্তরা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত। তারা জানে যে, তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। আবারও এও জানে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অধীনস্থ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা যায়। এখানে আশা করা হত যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাগরিকরা নিজেদের যুক্ত করবে এবং সোভিয়েত সরকারের কার্যাবলী স¥¤ন্ধে সজাগ থাকবে। নাগরিকদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সংযুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করা হত। অথচ, একই সময় শাসকগোষ্ঠী শাসিতদের থেকে আনুগত্য ও সরকারি নির্দেশের প্রতি ঐক্যমত আশা করত।

(৩) সংকীর্ণ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochal Participant Political Culture)— এখানে উপকরণ (Input) কাঠামো প্রধানত আঞ্চলিক, যেমন উপজাতীয় বা জাতি-সংগঠন, যদিও উপকরণ কাঠামো খুবই উন্নত। কিন্তু উপকরণ-উৎপাদন উভয় কাঠামোই সংকীর্ণ স্বার্থের চাপ বিশিষ্ট হওয়ায় জাতীয় অংশগ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে তাদের কার্যাবলী খুবই প্রভাবিত হয়।

(৪) পৌর সংস্কৃতি (Civic Culture)—এর মধ্যে তিনটি আদর্শ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংযুক্ত। অধীনস্থ মানসিকতা থাকায় সমাজের গণমান্য শ্রেণী যথেষ্ট উদ্যম ও স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী মানসিকতা থাকায় গণমান্য শ্রেণী জনগণের পছন্দ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয়। অ্যালমন্ড ও ভার্বার মতে, ব্রিটেন ও আমেরিকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল পৌর সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ।

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করা যায়?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করুন)
২। মিশ্র সংস্কতি কী? মিশ্র সংস্কৃতির ধরনগুলি কী কী?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করুন)

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকসমূহ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় বা মিশ্র, যাই হোক না কেন তা বিভিন্ন উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। উপাদানগুলি সংখ্যায় অনেক এবং তাদের সম্পর্কও নিবিড়। এই ভিত্তিতে উপাদানগুলিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকও বলা যায়। নির্ধারকগুলি হল ঃ—

(১) ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা—যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। নিরবচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতা যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ভিত্তি স¥ন্ধে জানতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে অ্যালান বল আলোচিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারার পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য। গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অভিনব সমন্বয় ব্রিটেনের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। রক্ষণশীল ইংরেজ জাতির ঐতিহ্যবোধ ও সাবেকী মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পোন্নত সমাজের আধুনিক মূল্যবোধের মিশ্রণ ঘটেছে। কোনও বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই ব্রিটেনের সাবেকী অভিজাততান্ত্রিক কাঠামো শহুরে শিল্পোন্নত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

অথচ ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বিকাশ ভিন্ন ধরনের। ১৭৮৯-এ সংগঠিত ফরাসী বিপ্লব তৎকালীন ফ্রান্সের প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায়। নিরবচ্ছিন্নতার বদলে বিচ্ছিন্নতা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ফরাসী বিপ্লবজাত নতুন বৈপ্লবিক মূল্যবোধ বিশ্বাসকেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের রাজনৈতিক সংঘাতের কারণ বলা যায়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল প্রধানত ব্রিটেনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করার প্রচেষ্টা। এই যুদ্ধ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি স¥ন্ধে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীকালে আমেরিকার সংবিধানে গৃহীত হয়। ফলে এখানে অতীতের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সাম্যমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে শিল্পায়ন ও ব্যাপক অভিবাসনের (Immigration) ফলেও পরিবর্তিত হয় নি।

(২) ঔপনিবেশিক শাসন—রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন নতুন রাষ্ট্রের ওপর দীর্ঘকালীন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন সেই রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে প্রভাবিত করেছে। শাসকগোষ্ঠী প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং সেগুলি স¥ন্ধে তাদের মধ্যে কিছুটা সহমতও দেখা যায়। ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

(৩) ভৌগোলিক অবস্থান—ভৌগোলিক অবস্থান যে কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। ব্রিটেনের জলবেষ্টিত দ্বীপ-অবস্থান ব্রিটেনের বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমেরিকা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদান করেছে।

(৪) জাতিগত বিভিন্নতা—দেশবাসীর মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তবে জাতিগত বিভিন্নতার প্রভাব সব জায়গায় একরকম হয় না। জাতিগত পার্থক্য ব্রিটেনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা জাতের মানুষ বসবাস করলেও সকলে মার্কিন জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মার্কিনী হিসাবে ভাবে এবং মার্কিন সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায়। জাতিগত পার্থক্য ও উপজাতির আনুগত্যের প্রভাব অনেক দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। জাতিগত প্রবণতা প্রবল হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আনুগত্য জাতীয় সরকারের বদলে নিজ জাতির প্রতি প্রদর্শিত হয়। জাতিগত ভিত্তিতে পররাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সৃষ্ট হলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তেজনা ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

(৫) ধর্ম—আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও শিল্পায়নের বিকাশ সত্ত্বেও এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এমন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ধর্মের সম্পর্ক খুবই গভীর। প্রধানত উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ধর্মের রাজনীতিকরণ হয়েছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে এই দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতি আলোচনা সম্পূর্ণতালাভ করে না।

(৬) আর্থসামাজিক কাঠামো—আর্থসামাজিক কাঠামো রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম নির্ধারক। শহরকেন্দ্রিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বেশী থাকে। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাই এই ধরনের সমাজের জনগণ অধিকমাত্রায় রাজনীতি-সচেতন, প্রগতিশীল উদারমনোভাবযুক্ত ও পরিবর্তনের পক্ষপাতী হন। সরকারি নীতি নির্ধারণেও তাঁরা অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগাযোগ কম। জনগণ মূলত কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই এই ধরনের সমাজে রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তন বিরোধী প্রবণতা দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের হারও সেখানে কম।

(৭) রাজনৈতিক মতাদর্শ—আধুনিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের জনগণের রাজনীতি সংক্রান্ত মনোভাব, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম নির্ধারক বলা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর শ্রেণীকাঠামোর প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর ব্যক্তির চেতনার প্রকৃতি নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশের শ্রেণীকাঠামো বিভিন্ন রকম। তাই বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বিভিন্ন ধরনের হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যালান বল দু'ধরনের উপাদানের কথা বলেছেন ঃ-

—রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎসের প্রতি সমর্থনসূচক

মনোভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে। গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা দেখা যায়। মনে করা হয় যে, নেতারা জনস্বার্থেই কাজ করে—বিশেষ কোনও স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা অনেক কম, তবে এই শ্রদ্ধার অভাব মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতার কারণ হয় নি।

—স্থিতিশীল

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকারি কার্যাবলীর সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব থাকে। আবার সরকারি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির কল্যাণও আশা করা হয়। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা

আর্থসামাজিক বিকাশের স্তর ও শিক্ষার বিকাশের হারের সঙ্গে সংযুক্ত। শিক্ষার মান উন্নত হলে নাগরিকের নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সচেতনতা বাড়লে সরকারি কাজ স¥ন্ধে জনগণের সতর্কতা বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পায়। জনগণের নিজেদের সম্পর্কে সামর্থ্যের চেতনা বৃদ্ধি পেলে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্টি ও ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বাড়ে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

২১.৫.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক

যে কোনও সমাজে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীত ভারতীয় সংবিধানে প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতীকী মূল্য সকলেই স্বীকার করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও রাষ্ট্রপতি পদটি জনগণের কাছে প্রতীক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতীকগুলি প্রতিষ্ঠানের আদর্শমূলক উপাদানের প্রকাশ। জনগণের সামর্থ্যের স্তর বা রাজনৈতিক জ্ঞানের স্তরের সঙ্গে প্রতীকগুলির কোনও ওতপ্রোত স¥ন্ধ নেই। কিন্তু প্রতীকের মাধ্যমে জনগণের আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত হয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই প্রতীকের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কোনও কোনও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীকের বদলে ধর্মীয় প্রতীকও ব্যবহার করা হয়। কোথাও কোথাও জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্য কোনও ধর্মগুরুর ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে কিছু প্রাচীন গৌরব কাহিনী থাকে, যেগুলি জাতির মহত্ত্বের পরিচায়ক। অতীত সম্পর্কে এই সকল কাহিনী কখনও অসত্য, কখনও অর্ধসত্য হয়ে থাকে। অতীতের অবিশ্বাস্য কাহিনী বা অতিকথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটেনের এলিজাবেথের রাজত্বকাল সম্ভবন্ধে অতিকথা ইংরেজ জাতির জীবনে মহত্ত্ব ও গৌরব সঞ্চার করে।

প্রতীক বিমূর্ত ধারণাকে বাস্তবায়িত করে এবং প্রাধান্যকারী রাজনৈতিক মূল্যবোধকে প্রকাশিত করে। রাজনৈতিক প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত আবেগ উচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সরকার প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের সমর্থনসূচক মনোভাব জাগরণের প্রচেষ্টা করে। প্রতীকের মাধ্যমে সরকার তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার চেষ্টা করে। যে সমস্ত জাতি বা রাষ্ট্র ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রতীকের মাধ্যমে পূর্বতন সরকারের স্মৃতিকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলে, নতুনভাবে জাতীয় ইতিহাস লিখিত হয় এবং নব রূপে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংহতি সৃষ্ট হয়।

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকগুলি কী কী?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)

২। রাজনৈতিক সংস্কৃতির দু'ধরনের উপাদানগুলি কী কী?
(৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)

৩। রাজনৈতিক প্রতীকের গুরুত্ব কী?
(৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)

রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

সমাজে আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের প্রশ্নটি সরকারি সংস্থার প্রতি সমর্থনমূলক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় নতুন জাতির সদস্যরা শুধুমাত্র সরকারি উৎপাদনের (Output) সুযোগসুবিধা এবং যে মাধ্যমগুলির সাহায্যে চাহিদা উপস্থাপিত হয় তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তারা ইতিবাচক ও সমর্থনমূলক অধীনস্থ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেনি এবং আইন মান্য করতে শেখে নি। ফলে সেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় কোনও সমর্থন পায় না। অধিকাংশ নতুন জাতির ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা যায়।

যে সব ব্যক্তি উৎপাদন (Input) কাঠামোর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যাদের রাজনৈতিক সামর্থ্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গী আছে তারা তাদের স্বার্থে প্রয়োজনের সময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে অন্যান্য জাতির পার্থক্য দেখা যায়। আমেরিকার অনেক নাগরিকই কোনও স্থানীয় সমস্যার মুখোমুখি হলে কোনও স্থানীয় গোষ্ঠীকেই সমর্থন করবে এবং তাদের স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। ইটালির নাগরিকরা মনে করে যে, ব্যক্তি হিসাবে সে সরকারি কাজকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে যখন অসন্তুষ্টি প্রবল না থাকে, তখন নিষ্ক্রিয় সমর্থন দেখা যায় যতক্ষণ অসন্তুষ্টি প্রবল না হয়, ততক্ষণ রাগ, হতাশা ও নৈরাশ্য চাপা থাকে। পরে তা হিংসাত্মক আকার নিতে পারে।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে জাতপাতের তারতম্য ও উপজাতীয় আনুগত্য গুরুতর বিকাশসংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জাতিগত, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও উপজাতীয় এককগুলির নানা ধরন থেকে আফ্রিকায় জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সাধারণ বন্ধন (Common Bond) নেই। ফলে সদস্যরা তাদের স্থানীয় এককের বাইরে কোনও তথ্য জানে না, আনুগত্যও দেখায় না। জাতি গঠনে প্রক্রিয়ায় জাতীয় সত্তা স¥মন্ধে তথ্য সম্প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন, জাতীয় সত্তার প্রতি অঙ্গীকার প্রয়োজন। আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন জাতিগুলির ইতিহাসের কোনও-না-কোনও বিন্দুতে উপজাতীয় এককের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় আনুগত্যের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তখন জাতীয় অনন্যতার (Identity) প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয় অনন্যতার প্রশ্ন শুধুমাত্র নতুন আফ্রো-এশীয় জাতিগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক কালে আমেরিকার অনেক দক্ষিণবাসীর কাছে জাতিগত বিচ্ছিন্নকরণের প্রশ্ন জাতীয় অনন্যতার (Identity) ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে।

যে জাতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জাতীয় সংযুক্তির ঐতিহ্য নেই, সেখানে সমস্যাগুলি আরও গভীর; মীমাংসায় পৌছানো খুবই কঠিন ব্যাপার হতে পারে। স্থানীয় উপজাতি মনে করতে পারে যে, তার সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো, স্কুল নির্মাণ, শিল্পগঠন বা জাতীয় সামরিক বাহিনীতে যুবকদের ভর্তি দ্বারা বিঘ্নিত হতে পারে; আনুগত্যের দ্বন্দ্বের চরম উদাহরণ হল গণস¥œোহনী নেতাকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদ, যেমন ইজিপ্টের নাসের। মেক্সিকোর ব্যবস্থা মধ্যপন্থী সমাধান, সেখানে উচ্চ ধরনের সাধারণ সমর্থন ব্যবস্থা, একটি প্রাধান্যকারী দল ও সর্বজনস্বীকৃত বিপ্লবী প্রতীক নানা ধরনের বক্তব্য ও গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সাধন করে। ভারতবর্ষ

আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভিত্তি থেকে একই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছে। সাফল্য ঘটেছে কি ঘটেনি তা পরবর্তীকালে বিবেচ্য বর্তমানে উপজাতীয় আনুগত্য বিভিন্ন স্থানে খুবই প্রকট এবং এগুলি প্রতিহত করা প্রয়োজন।

সমাজের রাজনৈতিক আস্থার সাধারণ স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রতিযোগী ও বিরোধীরা কি পরস্পরকে সন্দেহ করে, রাজনৈতিক আলোচনা ও আদানপ্রদান কি তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ও সহজভাবে ঘটে, রাজনৈতিক বিষয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে কি সীমাবদ্ধ এই প্রশ্নগুলি কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। জার্মানী ও ইতালীতে গত ৫০ বছরের দুঃখজনক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য রাজনীতিকে ব্যক্তিগত আদানপ্রদানের বিষয় হিসাবে পরিত্যাজ্য মনে করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সংযোগ বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে ব্রিটেনে অভিজাত রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণের বিশ্বাস দেখা যায়। রাজতন্ত্র ও লর্ডসভা ব্রিটেনে এখনও বর্তমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে। জনসাধারণের জন্য দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণে কিছু শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। ভোটের উচ্চ সংখ্যা ও দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থেকে বোঝা যায় যে জনগণ বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে না, যদিও সামান্য কিছু লোকই সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে; ফলে এখানে সাম্যমূলক গণতান্ত্রিক সমাজের ধারণার সঙ্গে শ্রদ্ধামূলক অভিজাততান্ত্রিক সমাজের সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং একটি স্তরবিন্যস্ত অথচ ঐক্যবদ্ধ, সাবেকী অথচ আধুনিক রক্ষণশীল অথচ উদারনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছে ।

রাজনীতি কি সামঞ্জস্য বিধানকারী নাকি বিরোধ ও বিভেদসূচক প্রক্রিয়া—এই প্রশ্নটিও রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত। ব্রিটেনের সাধারণ ধারণা এই যে যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারা স্বার্থের বৈধ প্রতিনিধিত্ব করে। আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্ত স্বার্থযুক্ত লোকেদের পরামর্শ ও কথাবার্তার ঐতিহ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে বৈধতা প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করে তার প্রতিফলন। এরই উল্টো ধারণা হল এই যে রাজনীতির প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অবিরাম সংগ্রাম প্রয়োজন। মার্ক্সীয় মত এই পরিপ্রেক্ষিত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে। এখানে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকেই প্রাধান্যকারী শ্রেণীর অধস্তন শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা কিংবা শোষিতদের শৃঙ্খলামোচনের চেষ্টা বলে মনে করা হয়।

রাজনৈতিক আদানপ্রদানে শিষ্টাচারের (Civility) স্তর এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। সৌজন্য, রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি ও আদর্শ রাজনৈতিক ভিন্নমতের কঠোরতাকে কিছুটা হ্রাস করে। ব্রিটেন ও আমেরিকার আইনসভার রীতিসিদ্ধ ও রীতিবহির্ভূত প্রয়াসগুলি এই ধরনের প্রবণতার প্রতিফলন। এ জাতীয় পরিমিত আদর্শের (Moderating Norms) অভাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কার্যকরী করতে অসুবিধা হয়।

সংবেদশীল (Responsive) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি চরম পরীক্ষা হল সরকারি ক্ষমতা এক ধরনের নেতৃত্ব থেকে অন্য ধরনের নেতৃত্বের হাতে বদল করার ক্ষমতা। যদি ব্যক্তিগত আস্থার স্তর খুবই নিম্নমানের হয়, যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে জীবনমৃত্যু সংগ্রাম মনে করা হয় এবং রাজনৈতিক সৌজন্য উগ্র সংগ্রামকে প্রশমিত না করে তাহলে পদাধিকারী অভিজাত গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের ভূমিকা পরিত্যাগ করা এবং নতুন সরকারের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত ভূমিকা জানা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি প্রচলিত অর্থনৈতিক ধারার ও সামাজিক আচরণের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে নাকি সমাজ পরিবর্তনের উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়; রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য কি বাড়ানো উচিত, নাকি তাকে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত ও যতদূর

সম্ভব নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত, রাষ্ট্র কি বিস্তৃত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে নাকি অনিয়ন্ত্রিত বাজার-অর্থনীতি সমর্থন করে—এই প্রশ্নগুলি সবসময় গণনীতি সংক্রান্ত বিতর্কে ওঠে না? প্রায়শ রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিছু সীমা নির্ধারণ করে দেয় এবং বিতর্ক চলে সেই সীমাসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি কোনও বিশেষ নীতি মানছে কিনা তার ভিত্তিতে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি মূল্যবান ধারণামূলক যন্ত্র (Tool), যার সাহায্যে আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যক্তি ও সমষ্টির গুরুত্ব (Micro-Macro Gap) সহজেই অতিক্রম করতে পারি। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির আলোচনা থেকে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায় পৌঁছানো যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিগত ঘটনার আলোচনা (Case Study) থেকে সমষ্টিগত পরিসংখ্যান ও গোষ্ঠী আচরণের ধারা জানা যায়। এই ধারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক আচরণ প্রতিফলিত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স¥¤ন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর বণ্টন ব্যবস্থাকে প্রকাশ করে এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করে।

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বের দু'টি দিক আলোচনা করুন?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২। এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে কোনও একটি দিকের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

সারাংশ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত আধুনিক আলোচনার শুরু বিংশ শতকে অ্যালমন্ড ও ভার্বার হাতে। লুসিয়ান পাই, পাওয়েল, অ্যালান বল, বুবলাটস্কি ইত্যাদি লেখকও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতির প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব তাকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বদলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স¥¤ন্ধে জনগণের মনোভাবকে বোঝায়। এই মনোভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করতে পারে, বিরোধিতাও করতে পারে। তাই জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী সমজাতীয় হয় না, বিভিন্ন ধরনের হয়। কোথাও এই দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য বেশি হলে সেখানে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির অবস্থান থাকে। ভাষা, অঞ্চল, ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে ভারতে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির তিনটি দিক আছে—রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান বা ধারণা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম বা বিরোধী অনুভূতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল্যমান বিচার। তিনটি দিকের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে তিনভাবে ভাগ করা যায়—অংশগ্রহণকারী অধীনস্থ এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। তিনটি ধরনের কোনোটিই একক ও অবিকৃতভাবে কোথাও দেখা যায় না, মিশ্রিত থাকে। মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবার চারটি প্রকারভেদ হল—সংকীর্ণ-অধীনস্থ, অধীনস্থ-অংশগ্রহণকারী, সংকীর্ণ-অংশগ্রহণকারী এবং পৌর সংস্কৃতি।

ঐতিহাসিক বিকাশ, ঔপনিবেশিক শাসন, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতিগত বিভিন্নতা, ধর্ম, আর্থসামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শ্রেণী কাঠামো হ'ল রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন নির্ধারক। বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে জনগণের আবেগ, অনুভূতি ও উত্তেজনা জাগরণ দ্বারা একদিকে জাতীয় ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে এবং অন্যদিকে সরকার তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা চালায়।

যে কোনও দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতির ওপরই রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি চির পরিবর্তনশীল। নতুন ধারণা, শিল্পায়ন, নতুন নেতৃত্ব, যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে।

অনুশীলনী

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? রাজনৈতিক সংস্কৃতির তিনটি দিক কী কী? এই দিকগুলি কোন্ কোন্ রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত হতে পারে?

২। রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি কাকে বলে?

৩। রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করা হয়? মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরনগুলি কী কী?

৪। রাজনৈতিক সংস্কৃতির নির্ধারকগুলি কী কী?

৫। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করুন।

১। Gabrial A. Almond and Sidney Verva : The Civic Culture, Sage Publication, Newbury Park, London, New Delhi. 1989, pp. 1-44.

২। Lucian Pye & Sidney Verva (ed) : Political Culture and Political Development, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1965, pp. 1-24.

৩। Allan R. Ball : Modern Politics and Government, English Language Book Society & Macmillan, London, ELBS ed 1982, pp. 52-63.

৪। Amal Kumar Mukhopadhyay : Political Sociology, K.P. Bagchi, Calcutta—1994, pp. 86-102.

৫। অনাদি কুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম), কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৯৯।

৬। প্রাণগোবিন্দ দাশ : আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৮২-৫৯৮।

□

২২.০ উদ্দেশ্য
২২.১ প্রস্তাবনা
২২.২ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণা
২২.২.১ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য
২২.৩ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ
২২.৪ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম
২২.৫ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব
২২.৬ সারাংশ
২২.৭ অনুশীলনী
২২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণা ও তারা বিভিন্ন দিক আপনাকে জানানো। এখানে আলোচিত হয়েছে—

- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্ভবন্ধে বিভিন্ন লেখকের ধারণা
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মুখ্য ও গৌণ মাধ্যমসমূহ
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব

যে কোনও সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রজন্ম ধরে সমাজে সঞ্চারিত হয়। প্রজন্মগত ধারাবাহিকতা হল সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনও গোষ্ঠীর সদস্যদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে না। গোষ্ঠীর নতুন সদস্যদের দ্বারা সংস্কৃতিগত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী বহমান থাকে এবং সংস্কৃতি তার নিজের শক্তিতে কার্যকরী হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ দ্বারা সমাজের চিন্তাভাবনা, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এবং ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে। তাই সামাজিকীকরণ হল ব্যক্তির সামাজিক সংস্কৃতি শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া।

যখন এই সামাজিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত শিক্ষার রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা থাকে, তখন তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া ও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের পদ্ধতি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে না পারলে ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর প্রচলিত ব্যবস্থার সাফল্য, বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের আলোচনা আধুনিককালে খুবই জনপ্রিয়। তবে প্রাচীনকালেও এ সংক্রান্ত আলোচনা দেখা যায়। প্লেটো নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অ্যারিস্টটলও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের কথা বলেছেন। ফ্যাসিবাদী, নাৎসীবাদী সকলেই নিজ মতাদর্শের অনুকূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত ঘটে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে। চার্লস মেরিয়ম বিষয়টির ওপর আলোচনার সূত্রপাত করেন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জিত হয় এবং যার সাহায্যে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রবহমান হয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়, ব্যক্তির রাজনৈতিক পছন্দ নির্ধারিত হয় এবং ব্যক্তি নাগরিকের ভূমিকা ও আচরণবিধি আয়ত্ত করে। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ফল হল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন ভূমিকা এবং ভূমিকাপালনকারীদের স¥¤ন্ধে জ্ঞান (Cognition) মূল্যবোধ (Value Standard), ও অনুভূতি (Feelings)।

এবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ স¥¤ন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কী বলেন দেখা যাক। এস. এল. ওয়াসবির মতে, সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সময় এবং তারও প্রাক্কালে যে প্রক্রিয়ায় জনগণ রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জন এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। ওয়াসবির মতে, রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলতে শুধুমাত্র দলীয় পছন্দকে বোঝায় না, রাজনৈতিক স্বার্থ ও মতামতকেও বোঝায়। অ্যালান বল বলেছেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মনোভাব এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। জি. এ. অ্যালমন্ড এবং জি. বি. পাওয়েলের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সাধিত হয়, ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয় এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ইস্টন ও ডেনিস মনে করেন যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল সেই সকল বিকাশমান পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের ধারা অর্জন করে। সিজেলের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি যার সাহায্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত রীতিনীতি ও আচরণ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিদের শিক্ষিত ও উন্নত করে তোলা যাতে তারা রাজনৈতিক সমাজের কার্যকরী সদস্যে পরিণত হয়।

২২.২.১ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য

রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সময় হল শৈশব। কিন্তু এই শিক্ষা শৈশবের কয়েকটি বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তির সমগ্র জীবন জুড়ে এই শিক্ষা চলে। বড় বয়সের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক প্রভাব ব্যক্তির অল্প বয়সের ধারণাকে বদলে দিতে পারে, আবার সেই ধারণাকে শক্তিশালীও করতে পারে। শৈশবে পরিবারসূত্রে ব্যক্তি কোনও রাজনৈতিক দল স¥¤ন্ধে পক্ষপাতমূলক ধারণা পোষণ করতে পারে। পরবর্তীকালে শিক্ষা, চাকরী, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির ফলে তার মধ্যে সেই দল স¥¤ন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব সঞ্চারিত হতে পারে। নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ, রাজনৈতিক সামাজিক সংকট ইত্যাদির ফলে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আয়ত্ত করা প্রয়োজন হয়, পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করতে হয়। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে একটি আজীবনকালীন অভিজ্ঞতা বলা যায়।

বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশ বা মহাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রসারিত করার উপায় হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। এর ফলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তখন আবার নতুন করে সামাজিকীকরণ শুরু হয়। কিন্তু সামাজিকীকরণের অবলুপ্তি ঘটে না।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামোকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সরকার শিশুদের এবং বয়স্কদেরও নিজস্ব মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস শেখাতে চেষ্টা করে। বয়স্কদের মাধ্যমে শিশুদেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে আনুগত্য বা বিরোধিতা বা উদাসীনতাজনিত মতবাদ গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা তাই ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে কাজ করতে উৎসাহিত হয়।

অ্যালমন্ডের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল পরিবেশ থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রেরিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ (Input)। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জনমত গঠনে সাহায্য করে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, এবং সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রতীকের প্রতি সমাজের সকলের এক ধরনের মনোভাব থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যসাধন সহজ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এক ধরনের হলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গঠনের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। গোষ্ঠীগত এক ধরনের অভিজ্ঞতা, যেমন, সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি, সমাজ পরিবর্তনের দ্রুততা বা শ্লথগতি, দীর্ঘকালীন শান্তি বা ঘন ঘন হিংসাত্মক ঘটনা, অস্থিরতার উপস্থিতি বা অভাব ইত্যাদি জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধকে জোরদার করে। ফলে তাদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

ফ্রয়েড ও মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, সামাজিকীকরণ হল বিভেদকামী প্রবণতাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত পথে পরিচালিত করা ও সেই সঙ্গে তাদের সংযত রাখা। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর আদর্শ যা মানুষের জন্মগত বিভেদমূলক প্রবণতাকে সংযত করে ও সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করে, তার উল্লেখ করা যায়। আবার রুশোর বিশেষ ইচ্ছা বা ব্যক্তিগত প্রবণতাকে সাধারণ ইচ্ছায় রূপান্তরিত করার প্রসঙ্গও একই বক্তব্যের উপস্থাপনা করে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ অবশ্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—মনস্তত্ত্বের ওপর নয়।

তিন ভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপাদানগুলি সঞ্চারিত হয়—অনুকরণ (Imitation), নির্দেশ (Instruction), এবং প্রেরণা (Motivation)। রবার্ট লে ভাইন মনে করেন যে, এই পদ্ধতিগুলি শৈশবে কার্যকরী হয়। কিন্তু রাশ ও অ্যালথফের মতে, এগুলি সমগ্র সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গেই কার্যকরী। শিশুদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনুকরণ, নির্দেশ ও প্রেরণার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। শিশু অজ্ঞাতসারে তার পিতামাতার পছন্দগুলি অনুকরণ করতে পারে। আবার শহরে আগত গ্রামবাসী শহুরে দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণ দ্বারা নিজেকে শহরের অধিবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। রাজনৈতিক শিক্ষা, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ হল নির্দেশের উদাহরণ। সরকার আনুষ্ঠানিক বা প্রখ্যাত পদ্ধতিতে সমাজের স্বীকৃত মূল্যবোধ স¥ন্ধে জনগণকে নির্দেশ দিতে পারে। আবার শিক্ষকের কাছ থেকে প্রেরণার মাধ্যমে শিশু পরবর্তীকালে সুনাগরিক হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার বড় হাতিয়ার হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে জনগণকে একদিকে রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি শেখানো হয়, অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন, কোথাও একনায়কতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলে স্কুলের বইতে ইতিহাস বদলানো হয়, স্কুল ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করে নতুন সরকার বা একনায়কতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলে।

সমাজে কোনও কোনও ঘটনা বা অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন যুদ্ধ বা মন্দা লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বহন করে। অনেক পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। জাতীয় সংগ্রামে যোগদান দ্বারা এই জনগোষ্ঠীগুলি রাজনীতির নতুন ভূমিকা স¥ন্ধে ধারণা লাভ করে এবং নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এবং জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠন করে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাকে প্রবহমান রাখে। অন্যভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও সৃজন করে থাকে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেরণ দ্বারা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে। স্থায়ী ও সুস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে এই সংরক্ষণমূলক কাজ গুরুত্বলাভ করে। কিন্তু স্থায়ী ও সুস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ আধুনিক কালে সহজলভ্য নয়। অনেক জাতিই বর্তমানে পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামরত এবং নতুন সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পরিবর্তনসূচক কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক জাতি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রত, এজন্য নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সৃজনমূলক কাজ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। জাতির ঐতিহাসিক বিকাশ, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ, নাগরিক ও নেতাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ইত্যাদি উপাদানের ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের তিনটি ভূমিকার মধ্যে কোনটি বেশী কার্যকরী হবে। বাস্তবিক পক্ষে যে কোনও সমাজে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের এই তিনটি ভূমিকাই কোনও-না-কোনওভাবে বর্তমান থাকে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জাতির প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে, সরকারি ব্যবস্থার পক্ষে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করে।

অনুশীলনী - ১

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অর্থ কী? এ প্রসঙ্গে চারজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা লিখুন।
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণাটিকে বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দু'ধরনের হতে পারে—প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট এবং পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্ন (Direct or Manifest and Indirect বা Latent)। যে প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সরাসরি সঞ্চারিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। এখানে তথ্য, মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রাজনীতির স¥¤ন্ধ প্রত্যক্ষভাবে থাকে। উদাহরণ হল বিভিন্ন দল দ্বারা জনগণের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, মতাদর্শ ও অনুভূতি সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি সংক্রান্ত পাঠ বা পরিবার থেকে রাজনৈতিক দল স¥¤ন্ধে শিক্ষালাভ। যে প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সঞ্চারিত করা হয় তাকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। এখানে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা মনোভাবের বদলে অরাজনৈতিক মূল্যবোধ বা মনোভাব সঞ্চারিত হয়; কিন্তু এই অরাজনৈতিক বিষয়টি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মনোভাবকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হল শিশুর কর্তৃত্বের প্রতি মনোভাব, যা পরবর্তীকালে তার মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি রচনা করে।

সামাজিকীকরণ সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন দু'ধরনের বা উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন (Intentional & Unintentional) হতে পারে। শিক্ষক যখন ছাত্রকে আইন মান্য করতে শেখান, তখন উদ্দেশ্যমূলক সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ ঘটে। আবার শিশু যখন পুলিশ দ্বারা পরিবারের কোনও সদস্যের নিগ্রহ দেখে পুলিশকে ভয় করতে শেখে তখন উদ্দেশ্যহীন সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ দেখা যায়। আবার যখন শিশুকে শেখানো হয় যে, একটি ভালো ছেলে বড়দের মান্য করে তখন উদ্দেশ্যমূলক প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ ঘটে। তাছাড়া, শিশুটি যখন খেলাধুলায় যোগ দিয়ে নিয়মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তখন উদ্দেশ্যহীন প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের উদাহরণ দেখা যায়।

সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণের উদ্যোগ ব্যক্তির দিক থেকে আসে না, সামাজিকীকরণের সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ সংস্থার ভূমিকার থেকে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ঘটনা ও কাঠামোর সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তির ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তার প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ বিকাশলাভ করে।

সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ ও প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের মধ্যে সমন্বয় ও সহাবস্থান দেখা যায়। কোনোটিই এককভাবে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চারণ করতে পারে না। তবে কারও ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ অধিকতর কার্যকর, কারও ক্ষেত্রে আবার প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী - ২

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ স¥¤ন্ধে আলোচনা করুন।

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে।)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সকল দেশেই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশবাসীর সমর্থনসূচক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি মাধ্যম বা সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সংস্থাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(ক) প্রাথমিক গোষ্ঠী বা সংস্থা :

(১) *পরিবার*—এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাস সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী। শিশু পরিবার থেকেই রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে। পরিবারের মধ্যে তার জীবনের প্রথম ১০/১৫ বছরেই শিশু তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকাংশটাই অর্জন করে। সে বাবা, মা ও অন্যান্যদের মানসিকতা লক্ষ্য করে। সেগুলি তার মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অন্যান্য প্রভাব সত্ত্বেও তার শিশুকালীন রাজনীতি শিক্ষা বহাল থাকে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, আমেরিকার ৭৫% ভোটদাতা পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী চলেন। উইলির একটি ছোট ফরাসী শহরের গবেষণা থেকে জানা যায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্ভবন্ধে বিদ্বেষ শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, যদিও স্কুলপাঠ্য বইয়ের অন্য ধারণা চিত্রিত করা হয়েছে।

পরিবার শিশুদের কাছে বহির্জগতের বাতায়ন; পরিবারের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। শিশু পরিবারের কর্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই আনুগত্য পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। পরিবার তাকে পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গো যুক্ত করে। এই অভিজ্ঞতা তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

শিশুর জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুদের পরিবারের গুরুত্বের কারণ হল ঃ—

(i) অনেকদিন ধরে পরিবারই একমাত্র সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুর জীবনে বর্তমান থাকে। পরিবারই তার দৈহিক, মানসিক ও বস্তুগত প্রয়োজন পূর্ণ করে। শিশুও পরিবারের ভালোবাসা ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। ফলে, সে সহজেই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী বা বাবা-মার ভালোমন্দ বোধ ও নৈতিক বিচার গ্রহণ করে।

(ii) শিশুর বাবা-মাকে অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। বাবা-মা তার কাছে অনুকরণযোগ্য মডেল বলে প্রতিভাত হয়। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো বৃহত্তর জগৎ থেকে নতুন ধারণা ও মডেল গ্রহণ করে ঠিকই, কিন্তু বাবা-মায়ের মডেল তার স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যায় না।

(iii) পরিবারের সদস্যরা একই পরিবেশে বসবাস করে, একই প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়, একই সংবাদপত্র পড়ে বা রেডিও, টেলিভিশনের একই অনুষ্ঠান দেখে। ফলে, পরিবারের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে একই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তি বড় হয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক ধারণা গড়ে তোলে না বা

কখনও পরিবারের ধারণার বিরুদ্ধতা করে না, একথা ঠিক নয়। কিন্তু তা হলেও তার মধ্যে পিতামাতার শিশুকালের প্রভাব থেকে যায়।

পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সাধারণত রক্ষণশীল প্রকৃতির হয়, কারণ পরিবার সাবেকী ধারণা ও মূল্যবোধ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করে। ফলে, পরিবারের মাধ্যমে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ প্রতিভাত হয়। আধুনিক বিকাশশীল সমাজগুলিতে এই ধরনের সমস্যা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

(২) *অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী* ব্যক্তির শৈশবকালে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তার জীবনে পরিবারের গুরুত্ব কমতে থাকে। স্বাতন্ত্র্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সদস্য হতে হয়। সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের গোষ্ঠীকেই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী বলা হয়। আধুনিককালে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণের ফলে সাবেকী জীবনধারার পরিবর্তন ঘটেছে--সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধুনিক সমাজে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের রাজনীতি বিষয়ক মনোভাব ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। ফলে, তাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার উন্মেষ ঘটে, তা তাদের রাজনৈতিক দক্ষতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে সহজ আদান-প্রদান ঘটে এবং আবেগপ্রবণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে। এর ফলে, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ সহজ হয়। তবে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সাফল্য নির্ভর করে রাজনীতিতে তার উৎসাহ আছে কিনা তার উপর। যেমন, আমেরিকার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজনীতির প্রতি উৎসাহ কম। ফলে তারা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কাজ ঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না।

(৩) *শিক্ষা প্রতিষ্ঠা*—বয়োবৃদ্ধির পর শিশু শিক্ষালাভের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তার জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বলাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম জাতীয়তাবাদী আদর্শ, জাতির অতীত গৌরব, জাতীয় ঐতিহ্য বা নেতাদের স¥¤ন্ধে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে দেশের প্রতি আনুগত্য বাড়াতে চেষ্টা করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে লেনিনবাদী-মার্ক্সবাদী দর্শনে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রেও এ ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষমতা যাদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাঁরা শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বল বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রসার করা হয়। প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অন্যান্য নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগ থাকে। এই সংযোগ তার রাজনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর বাইরে নানা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ফলে, তাদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের প্রবণতা গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশলাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মকানুন ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি নির্মাণ করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনও কখনও কোনও শিক্ষার্থীর মনে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী মূল্যবোধ ও মানসিকতা সঞ্চার করে। বিভিন্ন

দেশের ছাত্র আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেমন ১৯৬৮ সালের ফরাসী সংকটে ছাত্রদের ভূমিকা, আমেরিকার ছাত্রদের ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা বা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশাল আন্দোলন।

(খ) গৌণ গোষ্ঠী বা সংস্থা :

(১) *পেশাগত সংগঠন*—বৃত্তি বা পেশাগত ভিত্তিতে নানা সংগঠনের উদাহরণ হল শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, কৃষক সংগঠন ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলি পেশাগত স্বার্থের সংরক্ষণ করে থাকে। তবে আধুনিক কালে এগুলি কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে সংগঠনটি দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে দলীয় মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। সংগঠনগুলি একদিকে পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রচারকার্য চালায়, বিক্ষোভ-আন্দোলন ও ধর্মঘট করে ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে আবার সংযুক্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনী প্রচারকার্যে যোগ দেয় এবং নির্বাচনী তহবিলে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালায়। পেশাগত সংগঠনগুলির কাজ সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চিন্তা-ভাবনার সঞ্চার করা।

(২) *রাজনৈতিক দল*—রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণ সমাজের রাজনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, কারণ রাজনৈতিক দল নানা ধরনের মানুষকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়, নতুন রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক দল প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করতে পারে, আবার প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার আমূল পরিবর্তন চাইতে পারে। রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকা নির্ভর করে দলটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যধারা ও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি ও বিরোধী দল উভয়েই রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও জনগণকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে।

(৩) *গণমাধ্যম*—রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলি সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন উভয় ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে এগুলি বর্তমানে খুবই উন্নত হয়েছে। রাজনৈতিক ঘটনা ও ঘটনাসংক্রান্ত ভাষ্য গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে অতি দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের চিন্তাভাবনা বাড়ে, রাজনৈতিক সচেতনতার পরিধি প্রসারিত হয় এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের প্রবণতা গড়ে ওঠে। এগুলি হল প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা খুবই কার্যকরী। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা সরকার নিজ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য এগুলিকে পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে কাজে লাগায়। সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলে গণমাধ্যমগুলি রাজনৈতিক বিষয়ে সরকারের বক্তব্য সরাসরি জনগণের কাছে উপস্থাপিত করে। শুধু যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী তা নয়। উদারপন্থী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও গণমাধ্যমগুলি বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মূল্যবোধ গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে জানানো হয়।

(৪) *সরকারি কাঠামো*--সরকারি কাঠামো বিকেন্দ্রীভূত হলে বহুসংখ্যক নাগরিক সরকারি কাঠামো ও আমলাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সচেতনতা বাড়ে। আবার, সরকারি

কাঠামো কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণে থাকলে নাগরিকের সঙ্গে সরকারের যোগ কম থাকে। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিকাশ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৫) *ধর্মীয় সংগঠন*—রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অর্থবহ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক গণতন্ত্রগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। তবুও কোনও কোনও দেশে মহিলাদের রাজনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধ্যানধ্যারণার বিরোধের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য; আবার সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধর্মীয় মূল্যবোধ নাগরিকের মধ্যে নৈতিকতা বিকশিত করে যা রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

৩

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে তিনটি প্রাথমিক সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে যে কোনও তিনটি গৌণ সংগঠনের স¥ন্ধে লিখুন। (আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম বা সংস্থাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব, প্রতিক্রিয়া বর্তমান। একটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন মাধ্যম একই সঙ্গে কার্যকরী দেখা যায়। তাই এগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক নয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা সংগঠিত এক সমন্বিত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী, বা রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥ন্ধে প্রযোজ্য। কখনও কখনও এদের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে সামগ্রিক বিচারে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রয়োজন আছে। সমাজে প্রতিদিন নানা পরিবর্তন ঘটে। এগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করছে তা জানার জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্ভবন্ধে জ্ঞান প্রয়োজন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আজ স্বাধীন। এক সময়ে এরা ইউরোপীয় শক্তির অধীনে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তির রাজনৈতিক কাঠামো এই দেশগুলিতে পরিচিত ছিল। তাই তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুকরণে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোও আছে। পশ্চিমের প্রভাবে তাদের অবস্থা কেমন জানা প্রয়োজন। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির আর্থসামাজিক ব্যবস্থাও এখন পরিবর্তনশীলতার মুখে। এজন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির প্রয়োজন। মার্ক্সবাদ আবার প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তারা বুর্জোয়া সামাজিকীকরণকে মানে না। এই সকল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামাজিকীকরণ ধারাবাহিকভাবে চলে এবং এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। তাই, হঠাৎ কোনও পরিবর্তন এসে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না।

উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক দু'ধরনের রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দেখা যায়। তবে উভয়ের প্রকৃতি পৃথক। উদারনৈতিক রাষ্ট্রে পরিবর্তন যাতে সমাজকে ভাঙনের দিকে নিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও তার নিরবচ্ছিন্নতার ওপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য নানা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয় জনগণকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য। এখানেও ধারাবাহিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হলে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার সংকট দেখা যায়। রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটে, শেষ পর্যন্ত বিপ্লব দেখা দেয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি সরকার ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সকল স্তরে সমানভাবে ঘটে না। মূল সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। উপসংস্কৃতির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের নানা সমস্যা দেখা যায়। সরকার যখন বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে উপসংস্কৃতিকে মূল জাতীয় স্রোতের অভিমুখী করে তুলতে চায়, তখন উপসংস্কৃতির নেতারা বিরোধিতা করেন। তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেন। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সমতত্ব বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার সরকারি প্রয়াস উপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়। উপসংস্কৃতির নেতারা তা পছন্দ করেন না। ফলে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদকামী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে বিপজ্জনক। এ জাতীয় বিরোধের সুযোগে বাইরের স্বার্থান্বেষী শক্তি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করে। এজন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

৪

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত আধুনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে বিংশ শতকে। চার্লস মেরিয়ম, জি. এ. অ্যালমন্ড, জি. বি. পাওয়েল, রবার্ট সিজেল, ডেভিড ইস্টন, এস. এল. ওয়াসবি, অ্যালান বল ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ও জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একদিনে অর্জিত হয় না। শৈশব থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী ব্যক্তির মধ্যে এই প্রক্রিয়া চলে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতা গড়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাও স্থিতিশীলতা লাভ করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দু'ধরনের—সুস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন। সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয় স¥ন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অরাজনৈতিক মনোভাব স¥ন্ধে ব্যক্তি জানতে পারে, কিন্তু তা পরবর্তীকালে ব্যক্তির রাজনীতিসংক্রান্ত মনোভাবকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা সংস্থাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক সংস্থা এবং গৌণ সংস্থা। প্রাথমিক সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিবার, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর নিবিড় যোগ থাকে। গৌণ সংস্থাগুলি হল পেশাগত সংগঠন, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সরকারি কাঠামো ও ধর্মীয় সংগঠন। এখানে সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বদলে নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক দেখা যায়। উভয় ধরনের গোষ্ঠীর মাধ্যমেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পাদিত হয়।

সমাজের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রশ্নটি সংযুক্ত। আধুনিককালে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও অন্যান্য নানা পরিবর্তনের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গেলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১। রাজনৈতিক সমাজিকীকরণ বলতে কী বোঝেন? রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কয় প্রকার?

৩। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি কী কী?

৪। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১। G. A. Almond and Sidney Verba : The Civic Culture, Sage Publication, Newbury Park 1989, pp. 266-306.

২। G. A. Almond and G. B. Powell : Comparative Government, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, Bombay, Calcutta, New York.

৩। Allan Ball : Modern Politics And Government, English Language Book Society, London, LLBS ed 1982, pp. 63-71.

৪। Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology, Universities Press, Hyderabad, 1995, Reprint pp. 167-178.

৫। Amal Kumar Mukhopadhyay : K. P. Bagchi & Co. Calcutta, 1994, pp. 103-119.

৬। প্রাণগোবিন্দ দাশ : রাষ্ট্রতত্ত্ব, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৫৬৯-৫৮২।

৭। ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪১৮।

%%%%[Error generating pdf file. Please retry with these features turned off:
optimize CompressObjects]%%%%
The system cannot find the file specified.
C:\Documents and Settings\user\Desktop\EPS Paper II (M 5-8)\New Folder\81-90.pdf

□

২৪.০ উদ্দেশ্য

২৪.১ প্রস্তাবনা

২৪.২ ধর্মের ধারণা

২৪.২.১ ধর্মের স¥¤ন্ধে কিছু বক্তব্য

২৪.৩ ধর্ম ও সমাজ

২৪.৩.১ ধর্মের ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা

২৪.৩.২ ধর্মের নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা

২৪.৪ ধর্ম ও রাজনীতি

২৪.৪.১ ধর্মীয় রাজনীতি

২৪.৪.২ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি

২৪.৫ সারাংশ

২৪.৬ অনুশীলনী

২৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত সে স¥¤ন্ধে আপনাকে অবহিত করা। এ প্রসঙ্গে আপনি জানতে পারবেন—

- ধর্মের ধারণা ও ধর্ম স¥¤ন্ধে কিছু বক্তব্য।
- ধর্মের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা।
- ধর্ম ও রাজনীতির স¥¤ন্ধ।
- ধর্মীয় রাজনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি স¥¤ন্ধে ধারণা।

আগের এককে শিক্ষা ও রাজনীতির কথা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান এককে আমরা ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে ধর্মের অর্থ, তারপর ধর্ম ও সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা এবং সবশেষে ধর্ম ও রাজনীতির স¥¤ন্ধ, ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি স¥¤ন্ধে আলোচনা করা হল।

ধর্ম হল অতিপ্রাকৃত, অতিমানবিক, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং এই শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা। ধর্ম শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কিছু অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, উৎসব ও ধর্মীয় বিষয়। ধর্মকে অনেকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, মানবতা বা নৈতিক শুদ্ধতা মনে করেন।

সমাজে ধর্মের নানা উপকারী ভূমিকা আছে, নানা অপকারী ভূমিকাও দেখা যায়। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা করে, মানুষের ও সমাজের বাহ্যিক আচরণ ও মনের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে; দুঃখে বা বিপদে সান্ত্বনা ও নিরাপত্তা দেয়; সাহিত্য, শিল্পকলা, ললিতকলার উন্নতি ঘটায়; বস্তুজগৎকেও প্রভাবিত করে এবং সমাজে ব্যক্তিদের সৌভ্রাত্র ও ঐক্যের বন্ধনে গ্রথিত করে। ধর্ম নানা সমাজসেবামূলক কাজেও প্রেরণা দেয়।

ধর্ম আবার মানুষের উদ্যম, প্রচেষ্টা ও স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করে তাকে অদৃষ্ট নির্ভর করে তোলে; ধর্মান্ধতা ও বিজ্ঞান বিরোধিতার জন্ম দেয় এবং সমাজের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। মার্ক্স ধর্মকে উচ্চ শ্রেণী দ্বারা শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীনকালে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে রাজার প্রতি জনগণের দ্বিধাহীন আনুগত্য সৃষ্টি করত। মধ্যযুগের ইউরোপে পোপ ও রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে কে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি এই প্রশ্নে। ধর্ম নানা বিপ্লব ও আন্দোলনের সূচনা করেছে। আধুনিক নির্বাচনী রাজনীতিতেও ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রার্থী বাছাই বা মন্ত্রীসভা গঠনে ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীনকালে ধর্মীয় রাজনীতি প্রাধান্য পেত। আধুনিক কালে প্রায় সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ধর্মের ধারণাটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখা যাক। জেমস জি. ফ্রেজারের মতে, মানুষের থেকে উচ্চতর শক্তি, যা প্রকৃতির ধারা ও মানবজীবনের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টি সাধন হল ধর্ম। অগবার্ন ও নিমকফের আলোচনা অনুসারে ধর্ম হল মানুষের থেকে উচ্চতর শক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী। ম্যাকাইভার মনে করেন যে, ধর্ম বলতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এবং মানুষ ও উচ্চতর কোনও শক্তির মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায়। এমিল ডুর্কহাইমের অভিমত অনুসারে ধর্ম হল এক ধরনের বিশ্বাস ও এক বিশেষ পদ্ধতি যার সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি পবিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে। এম. সি. ট্যাগার্টের মতে ধর্ম হল একটি আবেগ, যা মানুষ ও বিশ্বসংসারের মধ্যে ঐক্য আছে, এই প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার কোঁৎ মনে করেন যে, ধর্ম ও মানবতা অভিন্ন। তিনি মানবতাকেই ধর্ম হিসাবে গণ্য করেন। ধর্ম বলতে ম্যাকেঞ্জী পূর্ণ শুদ্ধতার প্রতি আন্তরিক অনুরক্তিকে বুঝিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণণও বলেছেন যে, সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের অনুসন্ধানই হল ঈশ্বরের আরাধনা।

ধর্ম স¥¤ন্ধে মার্ক্সের ধারণা পুরোপুরি বিপরীত। তিনি ধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম হল উৎপাদনের মালিক শ্রেণীর হাতে একটি বিশেষ হাতিয়ার, যার সাহায্যে সমাজের দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীকে আফিমের নেশার ন্যায় মোহাচ্ছন্ন ও অবশ করে রাখা হয়। ধর্মীয় চেতনাকে তিনি মানুষের দাসভাবের পরিচায়ক মনে করেন। শ্রমজীবী জনগণ তাদের দুঃখকষ্টকে নিজেদের নিয়তি বা অদৃষ্ট মনে করে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। তাই ধর্ম থেকেই অদৃষ্টবাদ জন্ম নেয়।

অন্যদিকে আবার ম্যাক্স হ্বেবার ধর্মবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে স¥¤ন্ধ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

২৪.২.১ ধর্ম স¥¤

ধর্ম স¥¤ন্ধে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়।

(১) ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা বা দেবভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কোনও উচ্চতর শক্তির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সব ধর্মেই দেখা যায়। এই উচ্চতর শক্তিকে মহত্তম, সর্বগুণান্বিত ও শক্তিশালী মনে করা হয়।

(২) উচ্চতর শক্তির প্রতি বিশ্বাস থেকে মানুষের মনে নানা আবেগমূলক অনুভূতি, যেমন--ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। এগুলি ধর্মের অন্তর্গত।

(৩) ধর্মের একটি ক্রিয়ামূলক বা আনুষ্ঠানিক দিক আছে। নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় আবেগ বা অনুভূতি ব্যক্ত হয়। এইসব আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিও ধর্মের অন্তর্গত।

(৪) পার্থিব বা অপার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তিকে উচ্চতর শক্তির ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

(৫) ধর্ম একদিকে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানবজীবনে সর্বোচ্চ মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি আবার ধর্মের মধ্যে সামাজিক আদর্শ, সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক মূল্যবোধও দেখা যায়। তাই ধর্ম একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়।

(৬) সব ধর্মেরই একটা অন্তরঙ্গ এবং একটি বহিরঙ্গ দিক আছে। উচ্চতর শক্তির প্রতি আস্থা, অনুভূতি বা আবেগ হল ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক। আর ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ হল বহিরঙ্গ দিক। অন্তরঙ্গ দিকটি ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ আর বহিরঙ্গ দিকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) মার্ক্সবাদীদের কাছে ধর্ম কোনও উচ্চ ধারণা নয়, বরং মায়াজাল সৃষ্টি করে শ্রেণীশোষণকে অব্যাহত রাখার উপায়। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়।

১। ধর্ম স¥¤ন্ধে চারজন সমাজবিজ্ঞানীর বক্তব্য লিখুন।
(আপনার উত্তর ৪ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

ধর্ম একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। আদিম সমাজে ধর্মবোধ ও ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল এবং আদিম কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সবদেশেই মানুষের মন ও সমাজে ধর্মের স্থায়ী আসন দেখা যায়। ধর্ম তাই একটি বিশ্বজনীন বিষয়। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের সামাজিক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এবং সমাজজীবনের অনেকাংশ জুড়ে ধর্মের অবস্থান। ধর্ম ব্যক্তি-মানুষকে নৈতিক পথে পরিচালিত করে এবং অনৈতিক পথ থেকে রক্ষা করে। উচ্চতর সত্তার প্রতি বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করে। এই ভাব তার বাহ্যিক আচার-আচরণ ও মানসিক চিন্তাভাবনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে। অতি-প্রাকৃতের সমর্থন দ্বারা ধর্ম সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকেও রক্ষা করে। ধর্ম কিছু সামাজিক কাজকে সমাজের বিরুদ্ধতা ও ঈশ্বর-বিরোধিতা বলে প্রচার করে। ধর্ম কিছু কাজকে আবার সমর্থনও করে। এইভাবে ধর্ম সামাজিক জীবনের একটি মডেল স¥প্রন্ধে ধারণা দেয়। সমাজে বিভিন্ন ঘটনা, উৎসব বা অনুষ্ঠান কোনও-না-কোনও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উপনয়ন, দীক্ষা ইত্যাদি ঘটনা; হালখাতা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি উৎসব এবং শস্য বপন, ধান্যরোপণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার ও অনুশাসন দেখা যায়। তাই বলা যায় যে, ধর্ম ব্যক্তি-মানুষের আচার-ব্যবহার ও সমাজের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম ও সমাজের স¥প্রন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের এই নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা খুবই প্রাসঙ্গিক।

ধর্ম সমাজের ব্যক্তিদের বাহ্যিক আচরণ ও মনের চিন্তাভাবনাকে সংযত করে ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক উন্নতি ঘটায়। সুস্থ, সুন্দর সমাজজীবনের জন্য নীতিগত সততা খুবই প্রয়োজন। ধর্ম মানুষকে সততার শিক্ষা দেয় ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। অসৎ পথকে পাপ বলে চিহ্নিত করে অসৎ পথ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। ধর্মবোধের প্রভাব মানুষকে সহ্যশক্তি, সহানুভূতি ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজবদ্ধ মানুষ যাতে সামাজিক প্রথা ও নিয়ম ঠিকভাবে মেনে চলে এবং সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে ধর্ম সে ব্যাপারেও সহায়তা করে। তাই বলা যায় যে, ধর্ম নীতিবোধ ও সততার শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে সুনীতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে মাঝে মাঝে সমস্যা বা হতাশা দেখা দেয়। ব্যক্তি তার জীবনে দুঃখকষ্ট বা বিপদের স¥œখীন হলে হতাশাগ্রস্ত ও ভীত হয়ে পড়ে। উচ্চতর দৈবশক্তির আশ্রয় তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে। দুঃখবিপদে সে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। সমাজজীবনেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি মাঝে মাঝে সমাজকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। ধর্ম ও উচ্চতর সত্তার আশ্রয় সমাজজীবনে নিরাপত্তা বোধের সঞ্চার করে, আশার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে ধর্ম নিরাপত্তা, সান্ত্বনা ও আশা যোগায় এবং হতাশা বা বিপদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

ধর্মবোধের প্রেরণায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে নির্মিত হয়েছে নানা মন্দির, মসজিদ গির্জা, ইত্যাদি। নানা ধরনের সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলাও সৃষ্ট হয়েছে। তাদের শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, মাধুর্য ও কারিগরী উৎকর্ষ এখনও বিস্ময়কর বলে প্রতিভাত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের আবেদন

তাই সমাজে ভাস্কর্য, সৌধ, সঙ্গীত ও চিত্রকলার সমৃদ্ধিসাধন করেছে বলা যায়। অর্থাৎ, ধর্মের আবেদন মানুষের সৃষ্টিশীল প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং ধর্মের প্রভাবে সমাজের সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটেছে।

ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের বস্তুগত ব্যবহারিক জীবনেও পরিবর্তন এনেছে। ম্যাক্স হ্বেবার মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ ও ধর্মের সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা মানুষের ও সমাজের বস্তুগত জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধধর্ম পার্থিব জীবনকে অর্থহীন মনে করে ও বৈরাগ্যের ও নির্বাণের কথা বলে। তাই বৌদ্ধধর্মে বস্তুগত জীবনের সমৃদ্ধিকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। হিন্দুধর্মেও বস্তুগত সম্পদকে গুরুত্বহীন ভাবা হয়। তাই হিন্দুধর্ম অনুসরণকারী কোনও ব্যক্তি বস্তুগত সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট নন। ইসলাম ধর্ম পুঁজির বিরোধিতা করে। তাই পুঁজিবাদ সেখানে বাধা পায়। কিন্তু প্রটেস্টান্ট ধর্ম পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিকশিত করার সহায়ক শিক্ষা দেয়। তাই ইংল্যান্ড, হল্যান্ড বা আমেরিকায় পুঁজিবাদের অগ্রগতি ঘটেছে।

মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি ধর্মীয় সংগঠনগুলির সামাজিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগঠনগুলিতে উপাসনা, পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে বহু মানুষ একত্রিত হয়। বিভিন্ন মানুষের মেলামেশার ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ঈশ্বরের পিতৃত্বের ছায়ায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সৌভ্রাত্র ও সম্প্রীতি সৃষ্টি ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা।

ধর্মবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র 'অহং'-কে পরিত্যাগ করে বৃহৎ 'অহং' বা সামাজিক সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়; সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ সমষ্টিগত স্বার্থের চিন্তা করতে শেখে। ধর্মের মাধ্যমে তাই সমাজজীবনে ঐক্য ও সংহতি সাধিত হয়। ঈদ, খ্রীষ্টমাস, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবে বিভিন্ন ধরনের মানুষের যোগদান করে, একইভাবে আনন্দ উপভোগ করে এবং একই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। তাই সংযোগকারী বা সংহতিসাধনকারী হিসাবে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব খুব বেশি।

যথার্থ ধর্মবোধ ব্যক্তিকে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন ধর্মের জনহিতকর বা সেবামূলক নানা কাজ দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন খরা, বন্যা ও সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগ, যেমন যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি বিপদের সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন হতাশাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজ করে। তাছাড়াও ধর্মীয় সংগঠন পরিচালিত হাসপাতাল, বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, দাতব্য সংস্থা ইত্যাদিও দুঃস্থ, দরিদ্র, আর্ত মানুষের সাহায্য করে থাকে। ধর্মের এই সেবামূলক কাজের সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এতক্ষণ আমরা ধর্মের সামাজিক গুরুত্বের ইতিবাচক দিক দেখলাম, কিন্তু ধর্মের সামাজিক ভূমিকার কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দেয় এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে ব্যাহত করে। ধর্ম অন্ধবিশ্বাস, উচ্চতর শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা এবং নিয়তির কথা বলে। ফলে ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

ধর্মীয় প্রভাবে ব্যক্তি তার দুঃখকষ্ট ও বিপদকে অদৃষ্টের বা ভাগ্যের ফল মনে করে এবং দুঃখকষ্ট সহ্য করতে শেখে। তারা আশা করে যে, পরবর্তীকালে উচ্চতর সত্তার দয়ায় তাদের জীবনের অন্ধকার বিদূরিত

হবে। ফলে নানা সামাজিক অন্যায়কেও তারা নীরবে মেনে নেয়। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করার মনোবৃত্তি ধর্মের প্রভাবে গড়ে ওঠে। ফলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা জনগণ হারিয়ে ফেলে। ফলে মানুষ কর্মবিমুখ ও অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে।

ধর্মের অনেক সমালোচক মনে করেন যে, ধর্ম বিচার-বিবর্জিত এবং আবেগপ্রবণ চিন্তাধারার জন্ম দেয়। তাঁদের ধর্মান্ধতা, অন্ধ কুসংস্কার এবং জ্ঞানের অভাব ধর্মের অবদান। ধর্মবিশ্বাসীদের ধারণা এই যে, ধর্মের মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞান, সত্য ও দর্শন নিহিত। তাই ধর্মের বাইরে এগুলির সন্ধান অর্থহীন। এই ধরনের বিশ্বাস, তথ্য ও জ্ঞানের জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে ধ্বংস করে, সৃজনমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধিতা করে।

ধর্মবিশ্বাসী ভাবেন যে, ধর্মীয় অনুশাসন হল শাশ্বত ও চিরন্তন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা, নতুন ভাবনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধর্ম তার আচার-অনুষ্ঠান অপরিবর্তিতভাবে জনগণের উপর চাপিয়ে রাখে। ফলে ধর্ম প্রগতিশীল ধ্যানধারণার বিরোধিতা করে এবং রক্ষণশীলতার আমদানি করে।

ধর্মের মধ্যে যেমন সংহতিমূলক চেতনা থাকে, তেমনি আবার বিভেদমূলক শক্তিও থাকে। একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর একাত্মতা ধর্মবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। তেমনি আবার ধর্মবোধ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করে। ইতিহাসে ধর্মের ভিত্তিতে বৈরিতার উদাহরণ অনেক। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি ধর্মের মানুষের মধ্যে বৈরিতা, দাঙ্গা ও সংঘর্ষের উদাহরণ আছে। এই ধরনের বৈরিতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করে এবং সমাজে বিদ্বেষমূলক ও বিভেদমূলক মনোভাবের সূচনা করে।

মার্ক্সের মতে, ধর্ম সমাজে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ধর্ম নামক হাতিয়ারটি উচ্চশ্রেণী বা উৎপাদনের মালিকশ্রেণীর হাতে থাকে এবং এর সাহায্যে শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর শোষণ চালানো হয়। ধর্ম সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে আফিমের নেশার মতো। এই নেশায় তাদের বিভোর করে রাখায় তারা সমাজের উচ্চ শোষক শ্রেণীর শোষণ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। তাই মার্ক্স ধর্মকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করেন।

অনুশীলনী - ২

১। ধর্মের ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মের নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে লিখুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

ধর্ম ও রাজনীতি—একটি হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় এবং অন্যটি বাস্তব জীবনে পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। তা সত্ত্বেও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ একে অন্যকে প্রভাবিত করে এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃত্ব অনেক সময় ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং বৈধতা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ মতটি উল্লেখযোগ্য। এই মতানুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রের বৈধ শাসক। তাঁর মাধ্যমেই তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। রাজার আদেশ তাই ঈশ্বরের আদেশ। জনগণের কর্তব্য হল বিনা প্রতিবাদে তা মেনে চলা। রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করা। তাই রাজদ্রোহিতা হল ধর্মদ্রোহিতা। প্রাচীন ভারত, জাপান, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রচলন ছিল। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র বলা হয়। রামায়ণের রামচন্দ্র হলেন বিষ্ণু। হিব্রু ধারণা ও ওল্ড টেস্টামেন্টেও রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাবা হত।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতে ধর্মগুরু পোপ এবং রাষ্ট্রের শাসক রাজার মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলেছে। পোপ না রাজা—কে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি এই ছিল বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু। উভয়েই জনগণের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে জনগণের আনুগত্য দাবি করেন।

একই সমাজে দু'টি কর্তৃত্বের উদ্ভব ঘটে। প্রথম দিকে চার্চের পোপ প্রাধান্য বিস্তার করেন। অনেক সময় রাজসিংহাসনের জন্য অনেক উত্তরাধিকারী দেখা যেত। কখনও বা কোনও উত্তরাধিকারী মিলত না। ফলে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ভার চার্চ গ্রহণ করত। অনেক সময় চার্চ রাজার শাসনকে বৈধতা প্রদান করত বা নতুন বিজিত ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রসারে সাহায্য করত। মধ্যযুগের শেষে অবশ্য ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজাই স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন স্বীকার করে যে, জাতীয় রাষ্ট্রের রাজারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতালাভ করেছেন। তবে সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ এবং চার্চের ধর্মজগৎ ছাড়াও পার্থিব জগতে প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রাজাও অনেক সময় চার্চের সমর্থন খুঁজতেন।

ধর্ম অনেক সময় বিপ্লব, বিদ্রোহ বা আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। উদাহরণ হল প্রটেস্টান্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনে ধর্মীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সমন্বয় দেখা যায়। এই আন্দোলনের অন্যতম কারণ হল ক্যাথলিক চার্চের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং পোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের জন্য রাজাদের ইচ্ছা।

ধর্ম ও রাজনীতির যোগ প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ক্ষত্রিয়রা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতেন, অর্থাৎ রাজপদ লাভ করতেন। আবার হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়দের ওপর ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত। অর্থাৎ, রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপর ছিল ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা। আবার ধর্মীয় অনুশাসনে রাজার দায়িত্ব বা কর্তব্যেরও উল্লেখ থাকত। প্রাচীন চীনদেশের ধর্মীয় বিধান অনুসারে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল চীন সম্রাটের ওপর। তিনি তাঁর দায়িত্বপালনে অসমর্থ হলে মনে করা হত যে, তিনি শাসনের জন্য ঈশ্বরের অনুমোদন হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং, প্রাচীনকালে রাজার শাসনের কর্তৃত্ব ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা স্বীকৃত হত। আবার প্রজাদের অধিকারের প্রসঙ্গও সেখানে থাকত।

ধর্মানুরাগী ব্যক্তির রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। দেশের বিপদে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরাও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। রাজনীতির লোকেরাও ধর্মানুরাগীদের জীবনধারার

মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে অনুপ্রবিষ্ট করান। ফলে, আধ্যাত্মিক জগতের ধার্মিক মানুষেও রাজনৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধর্মের জগতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না।

আধুনিক যুগে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার প্রভাব দেখা যায়। নির্বাচনী সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মীয় দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করে। কোনও কোনও নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী বাছাই প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি ঐ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে দলীয় প্রতীক প্রদান করে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার পর মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সরকার ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের এবং বিশেষভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে না। রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গুরু বা আচার্য বা মৌলানাদের আশীর্বাদ ও সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়। ধর্মীয় নেতারাও এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এইভাবে ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধর্মীয় নেতারাও রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন এবং ধর্মীয় অনুগামীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ভোট দেওয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করেন।

ধর্মীয় বিষয় বা পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত ও রাষ্ট্রকেই ধর্মীয় রাষ্ট্র বলা হয়। এই ধর্মীয় রাষ্ট্রে ঐশ্বরিক আইন প্রচলিত থাকে, চার্চ বা যাজক সম্প্রদায় বা পুরোহিতদের প্রাধান্য থাকে এবং শাসনের বৈধতা আসে ঐশ্বরিক উৎস থেকে। মধ্যযুগে মুসলমানদের আমলে ভারতের শাসন ধর্মীয় রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত ছিল। সুলতানদের শাসনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলিকে কার্যকর করা। সুলতানরা প্রশাসনিক ও ধর্মীয় উভয় দিকেই চূড়ান্ত ক্ষমতাভোগ করতেন। সুলতানি আমলে শরিয়তের নির্দেশনামাই ছিল রাজকীয় অনুশাসনের ভিত্তি। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সামাজিক নিয়ম প্রণীত হত।

ইসলামীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি, শক্তি ও সংগঠন হিসাবে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে পয়গ¥রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর খলিফার কর্তৃত্ব দেখা যায়। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রাধান্য ছিল। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদই উলেমা নামে পরিচিত ছিলেন। উলেমারা শরিয়ৎ ব্যাখ্যা করতেন। সুলতানরা সেই ব্যাখ্যা মেনে তদনুসারে শাসন করতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপেও চার্চের প্রাধান্য ছিল। পোপ গেলাসিয়াস--১ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯২-৯৬) মধ্যযুগের ইউরোপে চার্চ ও রাজার দ্বৈত কর্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন যে, উভয়ের মধ্যে চার্চের দায়িত্বই অধিকতর। রাজার কর্তব্য ছিল ঐশ্বরিক মতে চলা; কিন্তু পোপ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। রাজার দায়িত্ব ছিল পোপের মতে চলা। এক শতক আগে সেন্ট অ্যামব্রোস বলেছিলেন যে, রাজা চার্চের অন্তর্গত, চার্চের ওপর নয়। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে ইউরোপে পোপের প্রাধান্য প্রচার করা হয়। রাজার ভূমিকা ছিল কর্তব্যপালন; রাজা তাঁর কর্তব্য ঠিকমত পালন করলে চার্চ ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ দ্বারা রাজার শাসনকে যাথার্থ প্রদান করত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মার্সিগ্লিও, ম্যাকিয়াভেলি বা বোডিনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চার্চের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য রাজনীতির জগতেও প্রসারিত ছিল।

বর্তমান ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। এখানে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর কোরান ও শরিয়তের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যেও কিছু ইসলামীয় রাষ্ট্র আছে। সেখানেও শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে শাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, নেপাল হল হিন্দুরাষ্ট্র। তবে আধুনিক কালে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত।

মানব সভ্যতার প্রথম যুগে ধর্মই ছিল সমাজ ও রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রণ। প্রাকৃতিক কার্যকারণ সূত্র, প্রকৃতির নিয়ম স¥ন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশ ইত্যাদি পরবর্তীকালে প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বদলে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রাধান্য দেখা যায়। ধর্মের দৃষ্টির বদলে যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। ধর্মীয় রাজনীতির বদলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

পশ্চিমী জগতে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক থেকে রাজনীতি ও পার্থিব বিষয় থেকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে পৃথক করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে, ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে অধার্মিক বা ধর্মবিরোধী বা দেবতাহীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না। রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মীয় বিবেচনার অবলুপ্তি, সব ধর্মের লোকেদের সমান সুযোগ, মনুষ্যসৃষ্ট আইনের প্রাধান্য, জনগণের নির্দেশ দ্বারা রাজনৈতিক বৈধতাকরণ এবং রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনাকে বোঝায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা হয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুরুত্ব লাভ করে এবং যুক্তির মানদণ্ডে সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বর্তমানের বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও পশ্চিমীকরণের প্রভাব এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বিকাশে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুকূলে নানা সাংবিধানিক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে।

এসত্ত্বেও বলা যাবে না ধর্ম ও রাজনীতির কোনও সংযোগ বর্তমানে নেই। ধর্মীয়, রাজকীয় বা পুরোহিততন্ত্র এখন আর নেই। কিন্তু রাজনীতি ও ধর্মের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয় নি। সংগঠিত খ্রীষ্টান ধর্মাবল¥ীরা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। ইহুদি ধর্ম, ইসলাম মৌলবাদ, চরমপন্থী ক্যাথলিক মতবাদ এখনও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে শিখ ধর্মাবল¥ীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী - ৩

১। ধর্ম ও রাজনীতির সম্বন্ধ আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মীয় রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

৩। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

আলোচ্য এককে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে ধর্মের ধারণা, তারপর ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক, ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা এবং সবশেষে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক, ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আলোচনা করা হয়েছে। ধর্ম এক উচ্চতর সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে। ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সেই উচ্চতর সত্তার আশীর্বাদ লাভ করতে চায়। ধর্মের মধ্যে একদিকে বিশ্বাস ও আবেগ অন্যদিকে কিছু কর্মপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান আছে। প্রথমটি ধর্মের ভিতরের এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের বাইরের দিক। অনেকে আবার মানবতা, শুদ্ধতা ও সত্যকেই ধর্ম মনে করেন। মার্ক্সবাদীরা ধর্মকে সমালোচনার চোখে দেখেন এবং ধর্মকে শ্রেণীশোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম সমাজে নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের বাহ্যিক আচরণ ও মানসিক ভাবনাচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিপদের সময় ধর্মের আশ্রয় ব্যক্তিকে, সমাজকে নিরাপত্তা প্রদান করে। ধর্মীয় প্রেরণায় নানা উন্নত সাহিত্য, চিত্রকলা, সৌধ, সঙ্গীত ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে এবং সংস্কৃতির উন্নতি ঘটেছে। বস্তুজগতের অর্থনৈতিক আচরণেও ধর্মীয় প্রভাব দেখা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বহু লোকের সমাবেশ তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং সমাজের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে। ধর্মের সমাজসেবামূলক কাজও কম নয়।

ধর্ম আবার ব্যক্তিকে উচ্চতর সত্তার প্রতি নির্ভরশীল করে তার স্বাধীন বিকাশকে বাধা দেয় ও তাকে ভাগ্যনির্ভর করে তোলে। ধর্ম অনেক সময় কুসংস্কারের জন্ম দেয় ও বিজ্ঞানবিমুখতা সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। ধর্মীয় আবেগ অনেক সময় বিদ্বেষ ও বিভেদমূলক প্রবণতা নিয়ে আসে। মার্ক্স তো ধর্মকে শ্রেণীশোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম আবার রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং রাজনীতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ ধর্মের সাহায্যে রাজার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। মধ্যযুগে পোপ ও রাজার মধ্যে বিরোধ ঘটেছে এবং উভয়েই নিজ প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করেছে। ধর্ম অনেক সময় বিপ্লব বা আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আধুনিক নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বলাভ করেছে।

মধ্যযুগে ইউরোপে ও ভারতে ধর্মীয় রাজনীতি প্রচলিত ছিল। এখন নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রাধান্যলাভ করেছে। ভারতের সংবিধান ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা ঘটিয়েছে। তবে এখনও মাঝে মাঝে রাজনীতি ও ধর্মের সংযোগ নানা মৌলবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা নির্বাচনী রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য।

১। ধর্ম বলতে কী বোঝায়?
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা কী?
(২০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

৩। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।
(৩০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

৪। ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি কাকে বলে?
(২০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

১) Rakhahari Chatterjee (ed.) : Religion, Politics and Communication, The South Asian experience, South Asian Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 110002, 1994, pp. 1-20.

২) Bottomore : Sociology, Blackie & Son (India Ltd.), Bombay, 1979 (4th Impression), pp. 237-249.

৩) Roumila Thapar : From Lineage to State, Oxford, New Delhi, 1990, pp. 62-7.

৪) অনাদি কুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম) ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪২১-৪৬১।

৫) Kingsley Davis : Human Society, Surjeet Publication, Delhi, 1981, pp. 509-545.

৬) টম বটোমার : সমাজবিদ্যা, অনুবাদক হিমাচল চক্রবর্তী, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, নিউ দিল্লী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৬২।

৭) ড. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, সেন্ট্রাল বুক পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৩৮-২৫৮।

□

২৫.০ উদ্দেশ্য

২৫.১ প্রস্তাবনা

২৫.২ রাজনৈতিক যোগাযোগ

২৫.২.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের সংজ্ঞা

২৫.২.২ বিষয়টির উদ্ভব ও বিকাশ

২৫.২.৩ সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

২৫.৩ রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উপাদান

২৫.৩.১ যোগাযোগের কাঠামো ঃ প্রকৃতি ও গুরুত্ব

২৫.৩.২ যোগাযোগের প্রক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক গতিশীলতা

২৫.৩.৩ ব্যবস্থার সক্ষমতা

২৫.৩.৪ রূপান্তর ক্রিয়া

২৫.৪ প্রযুক্তি বিপ্লব ও রাজনৈতিক যোগাযোগ

২৫.৫ উপসংহার

২৫.৬ অনুশীলনী

২৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- যোগাযোগ কেন রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি।
- 'রাজনৈতিক' ও 'যোগাযোগ'-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা; রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য।
- গ্রীকযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক যোগাযোগের উদ্ভব ও বিকাশে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট; রাজনৈতিক যোগাযোগের অতিসরল ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা।
- রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কাঠামোগত প্রেক্ষিত।
- যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গতিশীলতা।
- প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রবল অগ্রগতি।

প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক যোগাযোগ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিতে সক্রিয় গোষ্ঠী। এই বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার জন্য যে প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, এখানে তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব অবশ্যই এমন এক বিষয় বা রাজনীতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচনের দিকে নজর দেয়; তবে এই নজরেরও এক বৈশিষ্ট্য আছে। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ভিত্তি হল **বৈধ ক্ষমতা**। নিছক ক্ষমতার সঙ্গে বৈধ ক্ষমতার পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। নিছক ক্ষমতার পরিধি কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে **প্রভুত্ব (domination)**; এক্ষেত্রে যাদের ওপর প্রভুত্ব করা হয় তাদের ভূমিকা থাকে গৌণ। অন্যদিকে বৈধ ক্ষমতার পরিধিতে শাসিতের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই গুরুত্বের কথা মনে রেখে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে তত্ত্বায়ণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে থাকে 'ক্ষমতা' (power) ও প্রভুত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রয়াস। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber)-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। বলা যেতে পারে 'ক্ষমতা', 'প্রভুত্ব' ও 'কর্তৃত্ব' (authority)-র প্রকৃতিগত ভিন্নতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে তিনি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও অগ্রগতি সম্ভব করে তোলেন। পরবর্তী কালে তাঁর উপযুক্ত উত্তরসূরীগণ এই বিষয়ের বিস্তৃতিতে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

ক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ কারণেই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে প্রভাবিত করা এবং ঐ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অধিকার করার গুরুত্ব অসীম। রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হ্বেবার নিজেই উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রের এক বৈশিষ্ট্যের কথা ঃ রাষ্ট্র এমন এক সংগঠন যা শারীরিক বল প্রয়োগের অধিকারকে বৈধভাবে নিজের আয়ত্তাধীন রাখে ("The State is an institution that legitimately monopolises the means of physical coercion")।

সংক্ষেপে বলা চলে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের মূল প্রেক্ষিত দুটি ঃ (১) ক্ষমতার প্রেক্ষিত--কীভাবে অন্যকে/অন্যদের নিজের ইচ্ছাধীন করে রাখা যায়; (২) কর্তৃত্বের প্রেক্ষিত--কীভাবে এই ক্ষমতার প্রতি সম্ভাব্য গ্রহীতাদের স¥œতি নিশ্চিত করা যায়। আমরা যখন আমাদের মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করব তখন এই দুই প্রেক্ষিতের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যতীত মানব জীবন ও সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আমাদের চেতনা, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত সহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতির মূল চাবিকাঠিও এই যোগাযোগ। আমাদের জীবনের যোগাযোগের এই গুরুত্বের নিরিখেই বলা যায় যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ব্যতীত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে না। আসলে রাজনীতির মূলেই আছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য ও মতামত আদান-প্রদান করা হয়।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব, এই শতাব্দীতে রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া তত্ত্বায়ণ ও বাস্তবে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি বিষয়ই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে ঃ **যোগাযোগই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি।** এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল ডয়েশ (Karl Deutsch) তাঁর Nerves of Government নামক গ্রন্থের শুরুতেই বলেন, রাজনীতি ব্যাখ্যার কেন্দ্রমূলে রয়েছে যোগাযোগ বা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের দাবী।

রাজনীতির ভিত্তিতেই আছে কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে--তা যে-কোনো অঞ্চলই হোক বা গোষ্ঠীই হোক বা রাষ্ট্র ও সমাজের মতো বৃহৎ সংগঠনই হোক--সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গঠন যে, যৌথতার চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার মূলেই আছে যোগাযোগ। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের মূল তিনটি ক্ষেত্রে নজর দিলে দেখা যায় প্রতিটির মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে আছে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঃ

(১) **রাজনৈতিক বিন্যাসের সামাজিক ভিত্তি (Social foundation of political order)**—এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

(২) **রাজনৈতিক আচরণের সামাজিক ভিত্তি (Social base of political behaviour)**—এক্ষেত্রে নির্বাচন, রাজনৈতিক মতামত, রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যপদ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা সমর্থনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৩) **রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সামাজিক প্রেক্ষিত (Social dimensions of political process)**—এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতি ও অস্থিরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

তবে রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব সন্দেহাতীত হলেও এই প্রক্রিয়ার সংজ্ঞার বিষয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমরা রাজনৈতিক যোগাযোগের **সাধারণ** (general) ও **নির্দিষ্ট** (specific) **সংজ্ঞা** উল্লেখ করতে পারি।

২৫.২.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের সংজ্ঞা

'রাজনৈতিক' ও 'যোগাযোগ' এই দুই ধারণাকেই বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। ব্যাপকার্থে 'যোগাযোগ'-এর অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, বক্তব্য, সংকেত এবং প্রতীকের আদান-প্রদান ব্যাপকার্থে রাজনীতি এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধমে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে **ইচ্ছাকৃতভাবে** পরিবর্তন আনা যায়। এই সূত্রে বলা যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগ এক বিশেষ প্রক্রিয়া যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাকৃত ও প্রণোদিত কার্যকলাপ অঙ্গীভূত। রাজনৈতিক যোগাযোগের এই সাধারণ সংজ্ঞার পরিধি স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃত। এক্ষেত্রে কোনও এক নির্বাচন প্রার্থীর বক্তৃতা বা এক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলোচনা, এমনকি কোনও এক সংগঠনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর লিখিত নির্দেশও রাজনৈতিক যোগাযোগের আওতাভুক্ত।

অন্যদিকে রাজনৈতিক যোগাযোগের নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তা এমন এক প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্র সরকার সংক্রান্ত নানা তথ্য। ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন ও প্রেরণ। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের কয়েকটি গবেষণামূলক কাজের উল্লেখ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। হ্যারল্ড লাসওয়েল (Harold Lasswell) তাঁর Propaganda Technique in the World War (১৯২৭) গ্রন্থে রেডিও ও লিফলেট বণ্টনের মাধ্যমে যে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' ব্যাখ্যা করেছেন তা রাজনৈতিক যোগাযোগের নির্দিষ্ট সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে টেলিভিশন, পোষ্টার ও বক্তৃতা, ভূমিকা ও আইন বিভাগ উদ্ভূত যোগাযোগ প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদন এবং সংসদীয় বক্তৃতা রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণে সাহায্য করে। যদিও এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, উইলবার স্ক্র্যাম (Wilbur Schramm) ও সমমনোভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি অনেক বেশি। তাদের মতে, এই সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার ফলে ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে এই তথ্য সম্প্রচার ক্ষমতাযুক্ত এই বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরে রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব কমে যায়।

উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক যোগাযোগের এক বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন তথ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রেরিত হয়; এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি স্তরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান ঘটে থাকে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদরা এ বিষয়ে একমত যে রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দুটি মূল উদ্দেশ্য হল তথ্য প্রদান (twin form) ও **প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা** (persuasion)। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল ঃ **কে বা কারা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে? কার/কাদের পরিবর্তন হচ্ছে? কেন এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে?**

২৫.২.২ বিষয়টির উদ্ভব ও বিকাশ

রাজনৈতিক যোগাযোগের বিশ্লেষণ প্রধানত রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আওতাভুক্ত হলেও এই বিশ্লেষণের সূত্র রয়েছে কয়েকজন মহান দার্শনিকের চিন্তাভাবনায়। এক্ষেত্রে প্লেটো (Plato)-র **Gorgius,** এ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর **Rhetoric,** জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর **System of Logic** ও ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)-এর **The Prince** উল্লেখযোগ্য। প্লেটো তাঁর ঐ গ্রন্থে প্রচার (propaganda)-এর নৈতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ্যারিস্টটল ও মিলের উদ্দেশ্য ছিল উৎস হিসেবে বিতর্কের কাঠামোগত রূপ আলোচনা করা।

Rhetoric গ্রন্থে এ্যারিস্টটল প্রত্যয় উৎপাদনের তিনটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথম, বক্তার ব্যক্তিগত চরিত্র ঃ দ্বিতীয়, 'গ্রহীতা'র (audience) একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা; তৃতীয়, বক্তার বক্তব্যের প্রখরতা। এ্যারিস্টটল আরও উল্লেখ করেন, সার্থকভাবে এই প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বক্তার যুক্তিবোধ প্রখর হতে হবে ও এর সঙ্গে থাকতে হবে মানুষের আবেগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, পরবর্তী কালে মার্কস (Marx)-এর

German Ideology বা সোরেল (Sorel)-এর Reflection on Violence বা লেনিন (Lenin)-এর What is to be Done বা প্যারেটো (Pareto)-এর The Mind and Society রাজনৈতিক যোগাযোগের ঐ বিশেষ দার্শনিক ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতেই রাজনৈতিক যোগাযোগ ও এই প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায়। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উদ্ভাবিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের (representative democracy)-এর উদ্ভব ও ক্রমবর্ধমান প্রভাবের যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বিংশ শতাব্দীতেই জনগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই সচেতনতা বাড়ে যে ক্ষমতা পেতে বা টিকিয়ে রাখতে হলে শুধুমাত্র নিজে/নিজের বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি প্রণয়ন বা রূপায়ণ করলেই চলবে না। ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে গৃহীত নীতি সাধারণভাবে কাম্য এবং এই নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারীরাই নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে এই প্রত্যয় গড়ে তোলা সম্ভব তখনই যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি/গোষ্ঠী নিজের/নিজেদের ইচ্ছার দ্বারা অন্যদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ারূপে গণ্য করতে হয় যার মাধ্যমে প্রেরক কোনও রাজনৈতিক তথ্য গ্রহীতার কাছে এমনভাবে পাঠায় যে তার ফলে গ্রহীতা অন্যথায় যে কাজ করতো না তা করতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক যোগাযোগের এরূপ বর্ণনায় তিনটি উপাদান লক্ষণীয় ঃ

(১) রাজনৈতিক তথ্য; (২) রাজনৈতিক তথ্য প্রেরণ বা বণ্টনের বিশেষ পদ্ধতি ও (৩) গ্রহীতাকে একটি বিশেষ আচরণ পালনে বাধ্য করানোর ইচ্ছা। উদাহরণস্বরূপ এমন এক কথা ভাবা যেতে পারে যেখানে উন্নয়নের অভাবে স্থানীয় জনগণ নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল যে রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন বা স্থানীয় মানুষের দাবী ও অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। এ ধরনের প্রতিশ্রুতির ফলে এলাকার মানুষ তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ভোট দিলেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগ সার্থকভাবে ঘটল বলা চলে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের উদ্ভব ও বিকাশে আভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটের মতো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তাত্ত্বিক ও প্রক্রিয়াগত বিকাশের দুই বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। আমাদের আলোচনার সীমিত পরিসরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত গবেষণায় নতুনভাবে আলোকসম্পাত করা হয়। লাস্ওয়েল তাঁর পূর্বোল্লিখিত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)-এর চোদ্দ দফা কর্মসূচী (Fourteen Points) উদ্ভাবনের সময় থেকেই মিত্রশক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রচারভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করে। অন্যদিকে জার্মানীও নিজের কায়দায় রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে জার্মান শাসকবর্গ একপেশে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে জনগণকে বোঝায় যে জার্মান যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষতার অভাবে এই পরাজয় আসেনি; এই পরাজয়ের কারণ মিত্রশক্তির মিথ্যা প্রচারে জার্মানীর বিভ্রান্তি।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন নাৎসী সম্প্রচার অব্যাহত থাকে অন্যদিকে ব্রিটিশ ও মার্কিনী গুপ্তচর সংগঠনগুলি ঐ সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে নাৎসী সামরিক বাহিনীর গুপ্ত পরিচালনা সম্পর্কে হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক যোগাযোগ এক নতুন রূপ পায়। বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক। আলেকজান্ডার জর্জ (Alexander George) তাঁর Propaganda Analysis গ্রন্থে দেখিয়েছেন, নিয়মিত নাৎসী সম্প্রচারে বর্ণিত জার্মান নেতাদের ক্রমানুসার, পূর্বতন ঘটনাসমূহের উল্লেখ, সম্প্রচারে বর্ণিত কোনও এক বিশেষ আদলের পরিবর্তে নয়া আদলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, প্রস্তুতি প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কীভাবে জার্মানীর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ হদিশ করা হত। রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এখানেই যে এটি এমন এক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যখন তথ্য আদানপ্রদানে মুক্ত প্রবাহ থাকে না। এক্ষেত্রে 'নিহিত অর্থ' খুঁজতে হয় এমন এক পরিস্থিতিতে যখন কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী (এক্ষেত্রে নাৎসী) একদিকে যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সীমাবদ্ধতার জন্য সহজ স্বাভাবিকভাবে তথ্য সম্প্রচারও সম্ভব হয় না।

শীতল যুদ্ধ (Cold War)-এর আমলে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। যদিও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। কোনও রাষ্ট্রে শাসকবর্গ বিরোধীদের কাছে আপাত নিরীহ তথ্য আদানপ্রদান বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয় বা যখন রাজনীতিবিদগণ কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য তথ্য আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই 'নিহিত অর্থ' আদানপ্রদান করে। তখন এই পদ্ধতির বাস্তবায়িত হয়।

সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

আভ্যন্তরীণ স্তরেই হোক বা আন্তর্জাতিক স্তরেই হোক রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে যে ঐ প্রক্রিয়ার কোনও অতি সরলীকৃত সংজ্ঞার বিপদ অনেক। প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূলে নিশ্চয় থাকে তথ্য আদানপ্রদান প্রক্রিয়া। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে রয়েছে নানা ধরনের জটিলতা। এই কারণেই যখন দুই রাজনীতিবিদ পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন, সেই আপাত সরল প্রক্রিয়ার মধ্যে চাপা থাকতে পারে নানা জটিলতা। ঐ প্রকাশ্য বিনিময়ের মধ্যেই থাকতে পরে নানা গুপ্ত সঙ্কেত।

এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগের অতি সরল সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে ঐ প্রক্রিয়ার জটিলতা ধরা পড়ে না। দু-একটি উদাহরণের মাধ্যমে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন উল্লেখ করা হল যে রাজনৈতিক যোগাযোগের অতিসরল সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিবিদ্‌দের 'স্বাভাবিক সংলাপের' অন্তর্নিহিত সঙ্কেত ধরা পড়ে না। আবার কোনও মন্ত্রীর কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া ও সরকারের ওপর সেই কেলেঙ্কারির প্রভাবের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক যোগাযোগ তৈরী হয় তাও ধরা পড়ে না কোনও অতি সরল সংজ্ঞায়। আবার, কোনও এক জনসভায় এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা সম্পূর্ণ নীরব থেকেও তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘটাতে পারেন তাও ধরা পড়ে না কোনও অতি সরলীকৃত সংজ্ঞায়। আসলে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'তথ্য'কে ব্যাখ্যা করলে, যে তথ্য এই নীরব রাজনীতিতে অশৃক্ত তা দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের সরলীকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিপজ্জনক বলেই অন্য একটি প্রবণতা সম্পর্কেও কিছু রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ সাবধানতা অবল¥ম্বন করেন। এই প্রবণতা হল রাজনৈতিক যোগাযোগ ও প্রচারকে সমার্থক করে তোলা। রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বহু লক্ষ্যের একটি অবশ্যই প্রচার। এ বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এই লক্ষ্যকে 'একমাত্র' লক্ষ্য মনে করলে বিভ্রান্তি বাড়বে। যোগাযোগের অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ, আগ্রহ সৃষ্টি ও প্রণোদন (motivation)। এই লক্ষ্যগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করে রাজনৈতিক যোগাযোগকে 'প্রচার সর্বস্ব' করে তোলার অর্থ ঐ জটিল প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতা বদলে অংশবিশেষে গুরুত্ব দেওয়া।

রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উপাদান রাজনৈতিক তথ্যের প্রসার (dissemination) ঘটে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা, নির্বাচনী ইস্তাহার (manifesto), সরকারি সিদ্ধান্ত বা জননীতি সংক্রান্ত বিতর্ক প্রভৃতি রাজনৈতিক তথ্য প্রসারিত হয় রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, আইনসভা, দলীয় স¥েলন বা রেডিও টেলিভিশনের সম্প্রচার মাধ্যমে। তবে এই ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া **সংস্থানগতভাবে** (structurally) রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশবিশেষ। এই প্রক্রিয়ার মূলে অবশ্য থাকে সেই প্রশ্নসমূহ যা লাসওয়েল রাজনীতি ও যোগাযোগের সম্পর্কের ভিত্তি বলে গণ্য করেন। কে কী মন্তব্য করেছে, কী ভাবে, কার উদ্দেশ্যে, কী ধরনের প্রভাবসহ? (Who says what, in what channel, to whom, with what effects?)

রাজনৈতিক যোগাযোগের এই প্রক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে আমরা কাঠামোগত প্রেক্ষিতের আলোচনায় যাব।

যোগাযোগ কাঠামো ঃ প্রকৃতি ও গুরুত্ব

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে পাঁচটি কাঠামোর উল্লেখ করা যেতে পারে যার রাজনৈতিক তথ্য প্রসারের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ঃ (১) অনানুষ্ঠানিক মুখোমুখি যোগাযোগ; (২) সাবেকি সামাজিক কাঠামো--যেমন পরিবার, ধর্মীয় গোষ্ঠী; (৩) রাজনৈতিক 'উৎপাদ' (output) কাঠামো--যেমন আইন বিভাগ ও আমলাতন্ত্র; (৪) রাজনৈতিক 'উপপাদ' (input) কাঠামো--যেমন, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী; (৪) গণমাধ্যম।

অনানুষ্ঠানিক মুখোমুখি যোগাযোগের গুরুত্ব যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই অনিবার্য। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের এই ধরণের কাঠামো কীভাবে উন্নতমানের যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ইলিহু কাজ্ ও পল লাজারসফেল্ড (Elihu Katz and Paul Lazarsfeld) Personal Influence নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন অধিকাংশ ব্যক্তির ওপরই এধরনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী বা প্রতিবেশীর মন্তব্য বা বিবৃতি মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে যেসব সমাজে আনুষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল যেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের যোগাযোগই রাজনৈতিক

তথ্য আদানপ্রদান ও প্রত্যয় নির্মাণের একমাত্র পথ, তবে উন্নত আধুনিক সমাজেও এই ধরনের যোগাযোগের গুরুত্ব কিছু কম নয়। যদিও তা রাজনৈতিক যোগাযোগের একমাত্র ভিত্তি নয়। কাজ ও লাজারসফেল্ড দেখিয়েছেন যে কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতা ও মতামত অনেকাংশেই সৃষ্টি হয় কয়েকজন বিশেষ 'মতসৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দের' (Opinion leaders) মাধ্যমে যারা আমাদেরই "কাছের লোক"। ঐ বিশেষজ্ঞদ্বয়ের মতে, সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ও মিশুকে প্রকৃতির কারণেই তারা মতামত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'আধুনিক' রাজনৈতিক ব্যবস্থায় **সাবেকি সামাজিক কাঠামোয়** গুরুত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা গেলেও এর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট। যদিও সাবেকি সমাজে--যেমন আদিবাসী সমাজ--এই শ্রেণীর কাঠামোর উপস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজ 'প্রধান' বা সর্দার অথবা বয়োবৃদ্ধদের সংগঠন (council of elders) অথবা পরিবর্ধিত পরিবার বা ধর্মীয় নেতারা সমাজ বা জাতিগোষ্ঠীর কাছে তথ্য প্রদান বা ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধভিক্ষুদের ভূমিকাও প্রমাণ করে আদিবাসী বা প্রাচীন রাষ্ট্রে ধর্মীয় নেতাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে মৌলবিদের রাজনৈতিক ভূমিকা বা ফিলিপিন্সের মতো রাষ্ট্রে ক্যাথলিক যাজক ও আবেদি গোষ্ঠীর ভূমিকাও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে, এই বিশেষ কাঠামো উদ্ভূত রাজনৈতিক যোগাযোগ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্যও করতে পারে বা বাধাও দিতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় **'উৎপাদ' কাঠামোর** ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে সরকারি সংগঠনের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়। আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নীতি রূপায়ণের নানা নির্দেশ সংঘবদ্ধভাবে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে যায়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সরকার নামক 'সংগঠন' বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে ও সামাজিক সম্পদে সরলতা সৃষ্টি করে। নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের 'জনসংযোগ'ও সম্ভব হয় ঐ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিচারবিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। জনগণের নানা অভিযোগের নিষ্পত্তি করে এই বিভাগ সরকার সম্পর্কে জনমনে বৈধতা তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সংগঠনগুলি জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ তথ্যও (general information) প্রদান করে। অন্যদিকে বিশেষ তথ্য ছাড়াও নানা ধরনের খবর (news releases) প্রকাশ্যে এনে সরকারি সংগঠনগুলি গণমাধ্যমের তথ্য আহরণের বড় সূত্র হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার **'উপপাদ'** (input) **কাঠামোর মধ্যে** রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকাই প্রধান। প্রকৃতিগতভাবে এই ধরনের সংগঠন জনসাধারণের নানা দাবী/অভিযোগ ও স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচিতি ঘটায়, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ও এই ধরনের গোষ্ঠী সরকারি বিরোধিতার স¥œÅখীন না হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেখানে এরা সাধারণ নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যে প্রয়োজনীয় অথচ বিরল সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে নেতৃবৃন্দের নানাবিধ কাজকর্ম সম্পর্কেও জনগণকে অবহিত করা আবার রাজনৈতিক দল ও সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে নিজস্ব মতাদর্শ বা কর্মসূচী সমর্থন আদায় করে। এর মধ্যে দিয়ে জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি হয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষে ও একাবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে রাজনৈতিক যোগাযোগের যে বিশেষ কাঠামো প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে তা **গণমাধ্যম**। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, বই, সিনেমা গণমাধ্যমেরই বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য কাঠামোগুলির মধ্যে গণমাধ্যমই হল বিশেষীকরণ (specialization) ও পৃথকীকরণের (differentiation) সার্থকতম উদাহরণ। এই কাঠামোর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ওপর। যথোপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্য পেলে গণমাধ্যম নানা বাধা এড়িয়ে বহু মানুষের কাছে তথ্য/বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম। ঐ কারণেই গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি (mileage)-এর সঙ্গে অন্য কোনও মাধ্যমের তুলনা হয় না। সদিচ্ছা থাকলে শক্তিশালী গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্যে নানা বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে পারেন। গণমাধ্যমের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে তথ্য আদানপ্রদান হলে অবহিত (informed) জনগণ (public) নানাবিধ রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করতে পারে, এমনকি রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রয়োজনবোধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীকে পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে উৎসাহিত করতে গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং শাসকই হোক বা সাধারণ নাগরিকই হোক, প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়ে গণমাধ্যম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা রাখে। এই কারণেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুক্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল রক্ষা করতে মুক্ত গণমাধ্যমের ভূমিকাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান যুগকে বলা হয় গণমাধ্যমের যুগ। গণমাধ্যমের এই বিস্তৃতির ফলে রাজনৈতিক যোগাযোগে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটছে তা আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

এই সূত্রে বলা যায়, কোনও সমাজে বা রাষ্ট্রে উপরোক্ত কাঠামোসমূহ কতটা কার্যকরী হবে তা নির্ভর করবে ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রে এই কাঠামোসমূহের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মাত্রার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই কার্যকারিতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম হবে। শাসকমণ্ডলীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে ঐ কাঠামোসমূহের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। তবে একথাও ঠিক যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও কোনও এক মাত্রায় তথ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন আমরা জানি যে নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তাগত কারণে সেনসর (censor) প্রথা সব দেশেই চালু আছে। এক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে 'তথ্যই ক্ষমতা' এই ধারণাটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক গতিশীলতা

অ্যামন্ড ও পাওয়েল (G. A. Almond and G. B. Powell) Comparative Politics গ্রন্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, ব্যবস্থা সক্ষমতা (system capability), নীতিপ্রণয়ন (rule formulation) ও স্বার্থ প্রত্যক্ষকরণ (interest articulation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে চারভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয় ঃ (১) **সংরক্ষণ ও অভিযোজন ক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ** (Maintenance and Adaptation Function : Political Communication and Political Socializaiton); (২) **ব্যবস্থার সক্ষমতা ঃ**

যোগাযোগের প্রসার ও সামাজিক সচলতা (system capabilities : Expansion and Social Moblization); (৩) **রূপান্তর ক্রিয়া ১ ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নীতি প্রণয়ন** (Conversion Functions : Pol. Communication and Rule Making); (৪) **রূপান্তর ক্রিয়া ২ ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও স্বার্থপ্রত্যক্ষকরণ** (Conversion Functions : Political Communication and Interest Articulation)। নীচে এই চারটি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

আলোচনার পূর্ব সূত্র ধরে বলা যায় পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা চার্চ ইত্যাদির মতো ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবর্গের রাজনীতি/রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দিয়ে যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলে তা কোনও ব্যক্তিকে কোনও একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে পরিচিত করে তুলতে পারে আবার কোনও একটি ধারণা ভেঙে নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে। এই ধরনের যোগাযোগ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পশ্চিমি আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সরল কারণ ঐ দেশগুলিতে কিছু ক্ষেত্র (যেমন ঃ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের মধ্যে শ্রেণীবিভাজন) ব্যতীত তথ্যপ্রবাহ সাধারণভাবে সমজাতীয়। এই প্রক্রিয়া অনেক জটিল আকার ধারণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে তথ্যপ্রবাহের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তবে যে-কোনও পরিস্থিতিতেই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের এই ভূমিকার সঙ্গে মতসৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই যোগাযোগ সামাজিকীকরণের 'ভাঙাগড়ার খেলা'ই নির্ধারণ করে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ বা অভিযোজনের মাত্রা।

ব্যবস্থার সক্ষমতা

কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই আধুনিক যুগে 'তথ্য বিস্ফোরণের' (Info-explosion) হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এর সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য দাবী ও চাহিদা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটার সঙ্গেই সমাজের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী, আঞ্চলিক গোষ্ঠী, প্রভৃতি নিজস্ব চাহিদা প্রেরণে সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কারণ এই দেশগুলির সাবেকিয়ানা (traditionalism) ও খণ্ডীকরণ (fragmentation) দূর করে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সচলতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।

আসলে সামাজিক সচলতা অনেকাংশেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার ফল। নগরায়ণ, সাক্ষরতা, প্রাচীন প্রথা—সম্পর্ক-বিশ্বাস-রীতিনীতির ধর্মীয় শাসন মুক্ত করা, কর্মসংস্থান—এ সবই জড়িয়ে আছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে। এই ধরনের সচলতা যেমন একদিকে কাম্য, অন্যদিকে এর মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্ষমতাও পরীক্ষিত হয়। যদি নানা দাবী ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সামাজিক সচলতার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে অনেক সময় এমন আকার নেয় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তা সামাল দিতে পারে না; এক্ষেত্রে নানা অস্থিরতা ও অসন্তোষ সমাজে দেখা দেবে যার মধ্যে দিয়ে ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হতে পারে। সমাজতত্ত্ববিদরা যাকে "ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপ্লব" (revolution of rising

expectations) বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এভাবে এক উভয় সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেয়।

রূপান্তর ক্রিয়া

নীতি প্রণয়ন নির্ভর করে সিদ্ধান্তের ওপর। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবার প্রয়োজন নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন নীতি প্রণয়ন করবেন তখন স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসাধারণের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যাদি তাদের কাছে থাকা জরুরি। তবে, তথ্য সরবরাহে সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতির সম্ভাবনাও থেকে যায়। নানাবিধ কারণে তা ঘটতে পারে। প্রথমত ঃ একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট মাত্রাতেই তথ্য ব্যবহার (process) করতে পারে। দ্বিতীয়ত ঃ ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আবেগ ও প্রবণতা ও অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটতে পারে। বিশেষ করে যে ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা উচ্চপর্যায়ের কেন্দ্রীভূত সেসব ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতির সম্ভাবনা বেশি। অন্যদিকে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিচ্যুতির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটলে সামান্য সংখ্যক শাসক ও উচ্চপদস্থ আমলার পক্ষে রাষ্ট্রের অজস্র দায়িত্ব সংক্রান্ত অসংখ্য তথ্য মনে রাখা ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃবর্গের ক্ষমতা সম্পর্কে জনগণের শ্রদ্ধা থাকলেও কারও পক্ষেই সামরিক প্রযুক্তি, রাজনৈতিক কৌশল, মুদ্রাস্ফীতি, পরিবহন, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শিল্পায়ন প্রভৃতি ভিন্ন চরিত্রের বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের ওপর নিজের দখল রাখা অসম্ভব। অন্যদিকে, বর্তমান যুগে বহু তথ্যের (technical) প্রকৃতির কারণে নেতৃবৃন্দের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়। এ ছাড়াও আছে শাসক ও প্রশাসকদের নানা ধরনের অযৌক্তিক কাজকর্ম যা তথ্যবিকৃতিতে সাহায্য করে।

এলিট শাসকবর্গের ক্রিয়াকলাপ ও তার ফলান সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত পর্যায় তথ্য আদানপ্রদানের ভূমিকা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই "জনগণের আওয়াজ" (vox populi) স্পষ্টভাবে শাসকদের কাছে পৌঁছে যায়। তবে এই ধরনের যোগাযোগ বিন্যাসের অন্য একটি দিকও লক্ষ্যণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শাসকবর্গ এই জনসচেতনতা রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। নানাভাবে এই কাজ করা যেতে পারে। প্রথমত ঃ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বহু ক্ষেত্রেই কার্যকারণগত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শাসকগণ কোনও একটি নীতি গ্রহণের পেছনে প্রকৃত কারণ কী তা ব্যাখ্যা না করে সম্পূর্ণ অন্য কারণ তুলে ধরতে পারেন। দ্বিতীয়ত ঃ বর্তমান বিশেষীকরণের যুগে সরকারি কাজকর্ম বহু ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত জ্ঞান কৌশলগত জটিলতার সঙ্গে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে কোনও সরকারি নীতি বা পদক্ষেপ মূল্যায়ন করাও সেই নাগরিকের পক্ষে সহজ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ নাগরিকের কাছে সরকারি বাজেটের এই ধরনের দুর্বোধ্যতার কথা বলা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তৃতীয়ত ঃ অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ শাসনব্যবস্থা ও ঐ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকার ফলে কোনও

আগ্রহ বা সক্রিয়তা দেখায় না। সাধারণত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিকদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান বেশি হলে এ ধরনের নিস্পৃহতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে স্বার্থ প্রত্যক্ষকরণের কোনও তাগিদও চোখে পড়ে না। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে এই ধরনের পরিস্থিতি চোখে পড়ে।

প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে রাজনৈতিক যোগাযোগ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, এ অংশে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে প্রযুক্তি বিপ্লব। **পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গণমাধ্যম—বিশেষভাবে বৈদ্যুতিন** (electronic) গণমাধ্যম। বর্তমান জগতে রাজনৈতিক কর্মী (actors) ও সাধারণ নাগরিকের বহু ভূমিকা পালনে, বহু বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে এবং সাধারণভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমের এই প্রসার সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে পরিসর (space) ও সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। এর কারণ বিশ্বায়নের মূলে বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের এমন তীব্র অগ্রগতি যার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানসমূহের যোগসূত্রই সাধিত হয় না, স্থানীয় ঘটনা ও দূরবর্তী ঘটনা একে অন্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রশ্নই শুধু নয়, জাতীয় সত্তা ও সাংস্কৃতিক সত্তা বিশ্বসংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রশ্নও জড়িত। যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যোগসূত্র ও তার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন স্থানের মধ্যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে এবং তার ফলে আমাদের সময় ও পরিসরের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে, ভৌগোলিক ও সময়গত পার্থক্য সত্ত্বেও যেমন আমরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সম্প্রচার 'সরাসরি' দেখি। বলা যেতে পারে, দূরবর্তী এলাকাগুলির মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপনে যা যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক স্তরে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলছে। গণমাধ্যমে এক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার ফলে রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে গণমাধ্যম-উদ্ভূত ঘটনা (Media event) 'মিডিয়া ইভেন্ট'।

'মিডিয়া ইভেন্ট' বড় মাপের ঘটনা যা সাধারণভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 'গ্রহীতা'দের জন্য গণমাধ্যম দ্বারা পরিকল্পিত ও রূপায়িত হয়ে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। **মিডিয়া ইভেন্ট**-এর **গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী** (symbolic), **রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য** 'সাধারণ' ঘটনা থেকে একে পৃথক করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ রাজপরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠান (যেমন চার্লস-ডায়না বিবাহ), গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সৎকার (যেমন রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে) বা শান্তিচুক্তির স্বাক্ষর ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। উন্নত প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের সাহায্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এই ধরনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারি। ডি হ্যালিন ও পি ম্যানচিনি (D. Hallin and P. Mancini)-এর মতো প্রথম সারির গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মিডিয়া ইভেন্টের

গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, এই ঘটনাগুলি সামাজিক ফারাক দূর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক স্তরে 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষজ্ঞরা যেমন দেখিয়েছেন, আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত যুক্তরাজ্যের উচ্চতম পর্যায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের গুরুত্ব যতটা না গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণে ছিল তার থেকে অনেক বেশি ছিল যে মানবিকতার ভিত্তিতে ঐ বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য। ঐ বৈঠকগুলি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে রাজনৈতিক শত্রুতা দূর করে বন্ধুত্বের বাতাবরণ তৈরিতে দীর্ঘ দিনের শত্রুদ্বয় বদ্ধপরিকর। এর মধ্যে দিয়ে 'দর্শক'রা এই বৈঠকগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন যার মধ্যে দিয়ে আবার ঐ বৈঠকগুলি বৈধতা অর্জন করে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে ভারত-পাকিস্তানের বাস চলাচল (১৯৯৯) ও তার সরাসরি সম্প্রচার এই আলোকে দেখা যেতে পারে।

উচ্চমানের তথ্যপ্রযুক্তি এই ধরনের 'মিডিয়া ইভেন্ট'কে অনেক সহজে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়। দূরবর্তী বিভিন্ন এলাকার বহু গ্রহীতা/নাগরিক এই 'ঘটনার' অংশগ্রহণ করে দর্শক হিসেবে পর্যবেক্ষক হিসেবে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রনীতির প্রচার ও বৈধকরণে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ ব্যবহার করা হয়। কাজ ও দয়ান্ (E. Katz and D. Dayan) Media Events গ্রন্থে বলেন —"কোনও ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার ঐ ঘটনার সাফল্যের বিষয়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে...এক্ষেত্রে ঐ ঘটনা শুধু সফল হলেই হবে না, এক বিশেষ সময়সীমার মধ্যে এই সাফল্য আসতে হবে।"

এক্ষেত্রে উল্লেখ উপরোক্ত গ্রন্থে লেখকদ্বয় 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে জনমত, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কূটনীতি, পরিবার, ধর্ম, প্রভৃতি বিষয়ের ওপর এর প্রভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যদিকে, 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর সমালোচনাও জোরালোভাবে হচ্ছে। রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় সমালোচনার গুরুত্বও কম নয়। সমালোচকের বক্তব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, গণমাধ্যম এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দেয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আধিপত্য কায়েম হয় ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব হারিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকারী ও নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলিতে ঘটা ঘটনা বিশ্বজুড়ে যত সহজে যে মাত্রায় সম্প্রচারিত করা সম্ভব তা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত প্রযুক্তির অধিকারী ও দুর্বল রাষ্ট্রের সীমানায় ঘটা ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর প্রবল প্রসার ও জনপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ চাপা পড়ে যায়। যেমন অতীতে যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বৈঠকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে এই দুই রাষ্ট্রে মতানৈক্যের বিষয়গুলি মতৈক্যের জোরদার প্রচারে চোখের আড়ালে চলে যায়।

'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্ব অলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ এও মনে করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহীতাদের মধ্যে অন্যভাবে কল্পচিত্র (images) সম্প্রচার করেও নিজস্ব ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। 'অন্যভাবে' বলতে এখানে এমন এক সম্প্রচার পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে যেখানে কল্পচিত্র এক নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিশেষ 'মোড়ক' (package)-এর অংশ হিসেবে উদ্ভূত হয় না। বরং এক্ষেত্রে কূটনৈতিক

প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে গণমাধ্যমকে দূরে রাখা হয়। গণমাধ্যমের উপস্থিতি মানে কোনও কূটনৈতিক বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের বিব্রতকর প্রশ্নের স¥œখীন হওয়া বা বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের, 'অন্যরকম' বিশ্লেষণ হওয়া বা বহিরাগতদের বিতর্কে জড়িয়ে ফেলা। এই ধারণা থেকেই জন্ম নেয় এই বিশ্বাস যে গণমাধ্যম অতিরিক্ত নজর কূটনীতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে। একারণেই অনেক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া গণমাধ্যমের চোখের আড়ালে 'গোপনীয়তা' রক্ষা করে সংঘটিত হয়। তবে, এর ফলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। তথ্যবিপ্লবের যুগে একথা সর্বজনবিদিত যে রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা সামান্য নয়। অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও নাটকীয় পরিবর্তনের বদলে গণমাধ্যমের কাজ হয় নানা তথ্যকে দৃষ্টিগোচরে আনা, নতুন তথ্য সরবরাহ করা। জনমতকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের পক্ষে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনা থেকে এ বিষয় স্পষ্ট যে এই প্রক্রিয়ার নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এই গুরুত্ব বৃদ্ধির নেতিবাচক দিকও আছে। তবে গণমাধ্যমের প্রবল উত্থানের যুগে নাগরিক একদিকে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যদিকে গণমাধ্যমের 'লক্ষ্য' হয়ে উঠেছে। দু'পক্ষেরই দাবী তারাই জনগণ। নাগরিকের স্বার্থে কাজ করে। যদিও বাস্তব চিত্র এই যে দু'পক্ষেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট, বহুক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার দাবী এতই জোরালো হয়ে ওঠে যে জনগণের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সয়ানসন (D. Swanson)-এর মতো বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো "দ্বিতীয় গণমাধ্যম-কেন্দ্রিক গণতন্ত্র"ও অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত অংশগ্রহণকারী হিসেবে না দেখে 'দর্শক' হিসেবেই গণ্য করা হয়। এই সমস্যার সমাধান তখন সম্ভব যখন জনসাধারণ রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব বুঝে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও গণমাধ্যমেরও ব্যবহার করে নিজেদের উপস্থিতি ও সক্ষমতা (capability) বাড়াতে ব্যবহার করবে। সাধারণ নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকা বাস্তবায়িত হলে রাজনৈতিক যোগাযোগের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য কী?

২। রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে হ্যারল্ড লাসওয়েলের বক্তব্য জানান।

স্বল্প পরিসরে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগের সর্বস¥œত সংজ্ঞা নেই কেন?

২। 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ব্যাখ্যা করুন।

২। রাজনৈতিক যোগাযোগ কাঠামোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

১। G. A. Almond and G. B. Powell : Comparative Politics (New Delhi), 1972, পরিচ্ছেদ ঃ "Communicative Function".

২। Michael Rush : Politics and Society (New York), 1992 পরিচ্ছেদ ঃ "Political Communication".

৩। David L. Shills ed. International Encyclopaedia of Social Science, Volumes 3+4, 1972, pp. 90-102.

□

২৬.০ উদ্দেশ্য

২৬.১ প্রস্তাবনা

২৬.২ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ সংজ্ঞা

২৬.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ বিশ্লেষকদের ভূমিকা

২৬.৪ অংশগ্রহন ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

২৬.৪.১ লিঙ্গ

২৬.৪.২ শিক্ষা

২৬.৪.৩ ব্যক্তিগত জীবনধারা

২৬.৫ অংশগ্রহণ ঃ কাঠামোগত-পরিবেশগত দিক

২৬.৫.১ রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা

২৬.৫.২ নীতি, সমাজ ও ধারণা

২৬.৬ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র

২৬.৬.১ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

২৬.৬.২ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

২৬.৬.৩ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

২৬.৬.৪ অংশগ্রহণ ও এলিট তত্ত্ব

২৬.৬.৫ অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তা ঃ মতামতের খতিয়ান

২৬.৭ বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র

২৬.৮ অনুশীলনী

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককের পরিশেষে আপনি যা জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অপরিহার্য ভূমিকা; রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞা;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্পর্কে লেস্টার মিলব্র্যাথসহ বিভিন্ন বিশ্লেষকের চিন্তাধারা;

- লিঙ্গ শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনধারা, রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা, নীতি-সমাজ-ধারণার বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মূল নির্দেশসমূহের পরিচয়;
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসঙ্গের অংশগ্রহণের প্রকৃত নির্ধারণ;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এলিট তত্ত্ব;
- অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তার আলোকে দুটি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতের খতিয়ান;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের 'আধুনিকতম ধারণা'—বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র যা নয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণের ধারণার উপর গড়ে উঠেছে।

২৬.১ প্রস্তাবনা

রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, আমরা প্রত্যেকেই এক বিশেষ, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করি। তাতে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ব্যবহার ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের আচরণের ধরন-ধারণে বৈচিত্র্য অনেক। কোনও কোনও ব্যক্তিকে রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় হতে দেখা যায়; এদের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক দলে যোগাদান করে, কেউবা নির্বাচনের সময়ে কোনও বিশেষ প্রার্থীর হয়ে প্রচারে সচেষ্ট হয়, কেউবা কোনও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকে। এদের মধ্যে কেউ রাজনীতির মাধ্যমে কোনও উচ্চ প্রশাসনিক পদে আসীন হন। অন্যদিকে বহু ব্যক্তি আছেন যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকেন, এমনকি ভোটদানেও তারা আগ্রহ দেখান না।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

সমাজবিজ্ঞানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব কোথায়? এর উত্তরে প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে, গণতন্ত্রই হোক বা অন্য বাবস্থাই হোক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত তা চলতে পারে না। আর এর মধ্যেই রয়েছে অংশগ্রহণের সূত্র। অন্যদিকে যে নাগরিক অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় সে অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় কম ক্ষমতার অধিকারী যদিও অংশগ্রহণকারী মাত্রই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় না, ও অংশগ্রহণ না করলেও ক্ষমতার ভাগী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়।

বিশেষকরে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারকে ঐ ব্যবস্থার অন্যান্য মূল বৈশিষ্ট্য যেমন স¥œ

৩. ২. ৪.

(dictated participation)

২৬.২ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ সংজ্ঞা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এমন স্বেচ্ছাধীন **(Voluntary)** প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের শাসক নির্বাচনে ও জননীতি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নেয়। এক্ষেত্রে

১

২

শুধুমাত্র সফল কার্যকলাপই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার আওতায় পড়ে না।

২৬.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ বিশ্লেষকদের ভূমিকা

(Lester Milbrath)

১৯৬৫ Political Participation : How and why do people get involved in Politics? (hierarchical)

/ (Gladiators), (Spectators), (Apathetic) ৬০%

(badge)

(progression)

(adjustment)

বহুক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যক্তিসমূহ (যেমন, 'যোদ্ধাগণ') অন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের (যেমন, 'দর্শক') মতো আচরণে লিপ্ত থাকেন

১৯৭৭ **Political Participation**-

(Sidney Verba), (Norman H. Nie) (J. Kim)-

Participation in America ¥œ The Modes of Democratic Participation Participation and Political Equality,

(specialization)-

(protestors), (community activists) (party and campaign workers), (communicators), (contactors) (voter) (inactive)

অংশগ্রহণ ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

(general)

/

এই অংশে আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নির্ণায়ক হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ ব্যাখ্যা করব। কারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং কেন করে?

(motivate)

(structural)

(Gender), (education), (life patterns)-

(Gender difference)

(variable)

এই ফারাক ভোটদানের হার, দলীয় আনুগত্য জননীতি বিষয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক নীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভোটদানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পঞ্চাশের দশকে গবেষকরা লক্ষ্য করেন, সাধারণভাবে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের প্রবণতা হল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। মহিলাদের ঐ ধরনের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন, দীর্ঘ আয়ু ও রাজনৈতিক সংগঠনে সক্রিয়তার অভাব ইত্যাদি কারণে মহিলাদের একধরনের প্রবণতা দেখা যায়।

পরবর্তীকালে গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে মহিলাদের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। পাশ্চাত্য দুনিয়ার উন্নত দেশসমূহে সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ও বিশেষভাবে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক পদে মহিলাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে; অনেকক্ষেত্রে, যেমন নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন ইত্যাদি দেশে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন Human Development Report-এ এই মাত্রায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে নারী সক্ষমতা (Women empowerment)-র প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যদিও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, আয়ারল্যান্ড ও ফ্রান্সে মহিলাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। পশ্চিমের অন্যান্য দেশে, মহিলারা এই রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠছেন। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এও দেখা গিয়েছে যে ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন, কানাডা প্রভৃতি দেশে নতুন প্রজন্মের মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি সংখ্যায় বাম দলের সদস্য হচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত গবেষণাসমূহ সম্পূর্ণভাবেই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের মতো উন্নতিশীল দেশগুলিতে মহিলা-পুরুষের ফারাক রাজনীতির বিভিন্ন স্তর ও ক্ষেত্রে বিদ্যমান। যে আর্থসামাজিক অবস্থায় এই দেশগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক বিন্যাস টিকে থাকে, সেখানে ঐ অবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা পিছিয়ে থাকবে।

Almond and Verba

(gladiator)-

(Charisma)

(skill)

২৬.৪.৩ ব্যক্তিগত জীবনধারা

২৬.৫ অংশগ্রহণ ঃ কাঠামোগত - পরিবেশগত দিক

/

(political efficacy)-

—

/ (Trust)

১

২

৩

৪ ¥¤

নীতি, সমাজ ও ধারণা

স্বীকৃত ও বৈধ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে।

—

—

১৯৭১

১৯২৮

(Maurice Duverger), (Vicky Randall), (Karstin Barkman)-

(resource position discrepancy)

ধারণাগত প্রেক্ষিতের সমর্থক যারা তারা বিশ্লেষণ করেন অধিপতি বিশ্বাস কাঠামো (dominant beliefs structure) কীভাবে রাজনৈতিক রুচি (preference) ও রাজনৈতিক আচরণ গঠনে সাহায্য করে।

২৬.৬ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র

¥¤

¥¤

১ ২ ৩

৪ — /

/ ৫ ৬

২৬.৬.১ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

(local govt. institutions)

(Electronic

democracy)

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

(common features)

প্রতিনিধিত্বমুখী গণতন্ত্রের ধারণাগত ও প্রক্রিয়াগত স্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়।

২৬.৬.৩ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারায় বিকশিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদভিত্তিক উদার গণতন্ত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য বহু আলোচিত বিষয়। তবুও এই স্বল্প পরিসরে এই বিকল্প গণতন্ত্রের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় পুঁজিবাদভিত্তিক গণতন্ত্রকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের রাজনৈতিক বিন্যাসের থেকে 'উন্নততর' ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হলেও এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতির 'সীমাবদ্ধতা' ও 'আনুষ্ঠানিকতা'র দিকেও এক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। একারণেই যুক্তি দেওয়া হয় যে অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে উদার গণতন্ত্র যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলে তা সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিষ্পেষণের পরিমণ্ডলে কখনোই বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই কারণেই ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগসুবিধা সমাজের অধিপতিশ্রেণীর সদস্যরা ভোগ করেন; অন্যদিকে, নিষ্পেষিত জনগণের কাছে এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা 'ফাঁপা প্রতিশ্রুতি'-তে পর্যবসিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই যে 'সার্বজনীন নির্বাচন'-এর বিষয় আমরা পূর্বাংশে আলোচনা করলাম সেই প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণের ব্যাপারটি এই বিকল্প চিন্তাধারায় **মেকি অংশগ্রহণ** (pseudo-participation) বলে বর্ণনা করা হয়।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে নতুন উৎপাদন ব্যবহার মধ্যে নিজস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। শোষণমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিমালিকানা বর্জিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের মাধ্যমে "প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা"র স্বাদ পায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথেই জন্ম নেবে সাম্যবাদী সামাজিক স্বশাসন যার মধ্যে জনগণের শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। এ পর্যায়ে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে রাজনীতির চিরাচরিত ভূমিকাও লুপ্ত হবে।

২৬.৬.৪ অংশগ্রহণ ও এলিট তত্ত্ব

সনাতনী এলিট তত্ত্বের প্রবক্তাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রধান আপত্তি এই যে এই প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস (hierarchy) ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এলিট তত্ত্বের মূলতত্ত্ব এই ঃ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শাসন শুধুমাত্র কাম্য নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। **এলিট তত্ত্বের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে তিন প্রবক্তার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত—গিটানো মস্কা (Gaetano Mosca), (Vilfred Pareto) (Roberto Michel)-** নিজেদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে এক না হলেও এরা এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন যে 'প্রতিনিধিমুখী-গণতন্ত্র' এক অত্যন্ত "বিপজ্জনক" ধারণা।

মস্কা, প্যারেটো ও মিচেল-এর বক্তব্য বাস্তব রাজনীতিতে বিপজ্জনক প্রয়োগের সম্মুখীন হয় যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ইতালির ফ্যাসিবাদী শাসকেরা এই 'এলিট তত্ত্বের' মাধ্যমে নিজেদের অগণতান্ত্রিক শাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। সম্ভবত অভিজ্ঞতার কারণেই মস্কা পরবর্তীকালে জনপ্রতিনিধিমুখীনতার সমর্থনে বলেন, এর ফলে অন্তর্মুখী ও অতিসন্তুষ্ট শাসকবর্গের মধ্যে বহুতত্ত্বের চেতনা

আসবে ও এই চেতনা কাম্য। প্রসঙ্গত শুমপিটার মনে করেন, এই প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা যায়; শুমপিটার মনে করেন, এই প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

তবে এলিট তত্ত্বের সঙ্গে পরবর্তীকালে যাঁর নাম জড়িয়ে যায়, তিনি সি-রাইট মিলস্ (C-wright Mills)। তাঁর The Power Elite গ্রন্থে রাইট মিলস্ মূলত মার্কিন সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 'ক্ষমতাগোষ্ঠী'র প্রবল উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। রাইট মিলসের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শিল্পোন্নত সমাজে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিদের নিয়েই এই ক্ষমতাগোষ্ঠী গঠিত হয়। এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী ও বেসরকারি সংগঠনে আসীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও রাইট মিলস এই গোষ্ঠীর সদস্য রূপে চিহ্নিত করেন। তবে রাইট মিলসের বক্তব্য মূল সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের পদ ব্যতীত শাসনব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে 'মধ্যবর্তী পর্যায়'-এর কর্মচারী ও জনসাধারণ নির্বাচন ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারে কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় শিল্পোন্নত সমাজে বণ্টনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে পরবর্তীকালে কিছু প্রভাবশালী তাত্ত্বিক বড় ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) তাঁর Who Governs ও Polyarchi Participation and Opposition গ্রন্থদ্বয়ে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হতাশজনক চিত্র তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে ডাল বা সমসাময়িক তাত্ত্বিকগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে কিছু ধরনের অংশগ্রহণ কাঠামোগতভাবে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের আওতায় আনা হয় এবং কিছু ধরনের অংশগ্রহণ কাঠামোগতভাবেই ঐ পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে যায়।

২৬.৬.৫ অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তা ঃ মতামতের খতিয়ান

১

২ —

৩

—

১

২

৩

¥¤

বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র

(electronic town meeting)

(electronic referendum)

একটি কম্প্যুটার আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বের কোনও প্রান্ত থেকে অন্য যে-কোনও প্রান্তে তথ্য ও বক্তব্য প্রেরণ বা গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই নিজেদের সচেতনতা বাড়াতে পারি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি—এই যুক্তিই বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ভিত্তি।

কিন্তু বাস্তবে

বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ব্যাপক রূপায়ণ সহজ নয়।

—

২৬.৮ অনুশীলনী

অতিসংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১

২

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১

২

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১

২

১ L. Milbreth and M. Goel : Political Participation, (Chicago), 1977.

২ D. L. Silhed : International Encyclopoedia of Social Sciences, Vol. 11 and 12, 1972, pp. 252-265.

৩। A. H. Birch : The Concepts and Theories of Modern Democracy (London), 1993.

৪ B. Axford et al. (eds) Politics : An Introduction, Political Participation (London), 1997.

□

২৭.০ উদ্দেশ্য

২৭.১ প্রস্তাবনা

২৭.২ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব

২৭.৩ শ্রেণীবিভাজন

২৭.৩.১ সাম্প্রতিক প্রবণতা

২৭.৪ কার্যকলাপ ও ভূমিকা

২৭.৪.১ প্রতিনিধিত্বকরণ ও অর্থসংগ্রহ

২৭.৪.২ নেতৃত্ব ও ভুক্তিকরণ

২৭.৪.৩ সংহতি ও বৈধকরণ

২৭.৪.৪ যোগাযোগ ও সচলতা

২৭.৪.৫ নীতি ও বিষয় উপস্থাপন

২৭.৪.৬ সরকার গঠন

২৭.৫ রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতা

২৭.৫.১ আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা

২৭.৫.২ বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা

২৭.৬ উপসংহার

২৭.৭ অনুশীলনী

২৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক দলের তাৎপর্য ও নেতিবাচক চিত্র।
- রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তত্ত্বায়ন—বিশেষভাবে মিচেলের "আয়রন ল অব অলিগার্কি"।
- রাজনৈতিক দলের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে শ্রেণীবিভাজনের ভূমিকা।

- রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও ভূমিকা।
- রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা।

২৭.১ প্রস্তাবনা

"রাজনৈতিক দল"-এর ধারণা এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে উদ্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিনিধিত্বমুখী প্রতিষ্ঠান ও ভোটাধিকার ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রসারলাভ করে। প্রথমদিকে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই সংগঠনসমূহ যেগুলি সরকারি পদ লাভের লক্ষ্যে এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের সহযোগে 'নির্বাচন প্রতিযোগিতায়' যোগ দিত। অবশ্য পরবর্তীকালে "রাজনৈতিক দল"-এর ধারণা পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সংগঠনও রাজনৈতিক দল বলে গণ্য হতে থাকে। যেসব ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংগঠন যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা কম, এমনকি নির্বাচন বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনও, রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বর্তমান যুগে যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এতই স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বর্জিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করাই যায় না; যদিও রাজনৈতিক দলের স¥¤ ¥¤
(rhetoric)

(interact aggregation) (interest articulation)

¥¤ (M. I. Ostrogoski) (R. Michel)

(Iron Law of Oligarchy)

২৭.৩ শ্রেণীবিভাজন

(Mourice Durverger)
Political Parties

(mass party) (cadre party)

(caucus);
(branch), (cell), (militia),

(coteric) (clique)

(agrarian);

(Giovanni Sartori) Parties and Party Systems

(atomistic)

(hegemonic) (pre-dominent)
(moderate) (extreme)

¥¤ (Joseph La Palombora)
(Myron Weiner) Political Parties and Political Development

(hegemonic ideological);
(hegemonic pragmatic); (turnover ideological);
(turnover pragmatic)

২৭.৩.১ সাম্প্রতিক প্রবণতা

রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত সমকালীন তত্ত্বায়নে শ্রেণীবিভাজনের থেকে মডেল নির্মাণে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল উল্লেখ করা হল ঃ

(১) **অনুন্নত আনুগত্যের মডেল** (Undeveloped Loyalty model) ঃ এক্ষেত্রে দল সমর্থকদের কাছ থেকে উচ্চমাত্রার আনুগত্য ও অবিচ্ছিন্ন সমর্থন দাবী করে। বিশেষ করে নেতাদের সমর্থনের ক্ষেত্রে ও নির্বাচনের সময় এই মাত্রায় আনুগত্য প্রকাশ জরুরি হয়ে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে আনুগত্যের কোনও রাজনৈতিক বা অন্যান্য সুযোগসুবিধার সম্পর্ক নেই।

(২) **উন্নত আনুগত্যের মডেল** (Developed Loyalty Model) ঃ এক্ষেত্রে সমর্থকদের কাছে দলের আনুগত্যের দাবীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পদোন্নতি ও নানা ধরনের সম্পদভিত্তিক ও রাজনৈতিক সুযোগসুবিধার প্রশ্ন।

(৩) **উন্নত অনানুগত্যের মডেল** (Developed Non-Loyalty Model) ঃ এধরনের মডেল বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ, যেখানে বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে জটিল সম্পর্ক আছে, যেখানে প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য তুলনামূলকভাবে দুর্বল; অন্যদিকে, উন্নত আমলাতন্ত্র ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

(৪) **অনুন্নত অনানুগত্যের মডেল** (Undeveloped Non-Loyalty Model) ঃ এক্ষেত্রে দল হয় খুবই দুর্বল অথবা অস্তিত্ববিহীন। যেসব রাষ্ট্রে এই মডেল প্রাসঙ্গিক সেখানে রাষ্ট্র ও পৌর সমাজের (Civil Society) মধ্যে পার্থক্য থাকে না; অন্যদিকে প্রাচীন সাংস্কৃতিক-সামাজিক আনুগত্যের প্রচন্ড প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীরা পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির জন্ম দেয়।

২৭.৪ কার্যকলাপ ও ভূমিকা

রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ও সাংগঠনিক যৌক্তিকতার মূলে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষার লক্ষ্য। সাধারণভাবে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) নীতিভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজনৈতিক মতাদর্শ চিহ্নিতকরণ; উন্নয়ন ও প্রচার;

(২) নির্বাচন প্রচার ও দলীয় সংগঠনের সাহায্যে জনসমর্থন তৈরি করা;

(৩) সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের গ্রন্থীকরণ ও প্রত্যক্ষকরণ;

(৪) দলে এলিটবর্গের সদস্যপদ বৃদ্ধি;

(৫) সরকার গঠন।

তবে মনে রাখতে হবে, কোনও রাজনৈতিক দল উপরোক্ত কার্যকলাপের প্রত্যেকটিতে সমান গুরুত্ব নাও দিতে পারে। যেমন জনসমর্থনের অভাবে সরকার গঠনের লক্ষ্য কিন্তু রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের আওতার বাইরে থেকে যেতে পারে। অন্যদিকে 'বিপ্লবী দল' সরকারি ক্ষমতালাভকে কার্যকলাপের তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিতে পারে।

কোনো রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নির্ধারণ করতে ঐ দলের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কে খুব নির্দিষ্ট মাত্রায় আলোচনা সহজ নয়। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করে রাজনৈতিক দলের সাধারণ ভূমিকা স¥¤

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ ঃ

বর্তমান যুগ জনমানসে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধ্যানধারণা নির্ধারণ করতে গণমাধ্যম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (image)

২৭.৪.১

¥œ

২৭.৪.২ নেতৃত্ব ও ভুক্তিকরণ

¥¤

(Joseph Schlesinger)

(Leader producing organisation)

সংহতি ও বৈধকরণ

¥œ

¥œ

যোগাযোগ ও সচলতা

—

—

নীতি ও বিষয় উপস্থাপন

(Common minimum programme)

সরকার গঠন

২৭.৫ রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতা

¥œ

বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা

¥œ

(heterogenous), (fragile)

উপসংহার

রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। যুক্তির বিস্তার যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক দল একটি মানবসংগঠন এই অর্থে যে এটি মানুষেরই সৃষ্টি। সুতরাং এই সংগঠনের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশা বা সম্পূর্ণ হতাশা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ সত্যটি মনে রাখা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। 'ককাস' ও 'ব্রাঞ্চ' বলতে কী বোঝেন?

২। রাজনৈতিক দলকে "নেতা উৎপাদনকারী সংগঠন" বলা হয় কেন?

১

২

১

২

১। M. Duverger : Political Parties (London), 1964.

২। R. Rose : Do Parties Make a Difference? (London), 1984.

৩। J. Blondal : Votero, Parties and Leaders (London), 1963.

৪। D. L. Sill (ed.) : International Encyclopedia of Social Sciences, 1972, Vols. 11 + 12, 1972, pp. 428-453.

৫। J. Blondel (ed.) : Comparative Government, (Harmondsmith), 1975.

৬। B. Axford ed.al. (eds.) : Politics : An Introduction, (London), 1997, "Political Parties".

□

২৮.০ উদ্দেশ্য

২৮.১ প্রস্তাবনা

২৮.২ গোষ্ঠী রাজনীতি ঃ ঐতিহাসিক সূত্র

২৮.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

২৮.৪ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ শ্রেণীবিভাজন

২৮.৫ ক্ষমতার নির্দেশক

২৮.৫.১ অর্থ

২৮.৫.২ সদস্যপদ

২৮.৫.৩ মতাদর্শ ও লক্ষ্য

২৮.৫.৪ জনমানসে ধারণা

২৮.৬ উপসংহার

২৮.৭ অনুশীলনী

২৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- গোষ্ঠী রাজনীতি সংক্রান্ত তত্ত্বায়নের ঐতিহাসিক সূত্র। এক্ষেত্রে পশ্চিমি তত্ত্ববিদদের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রকৃতি।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজন।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতার নির্ণায়ক।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর আলোচনার সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপক ধ্যান-ধারণা ও সেই বিষয়ে নানা দৃষ্টিকোণ জড়িয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মূল উপাদন রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ হলেও

এ সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও তত্ত্ব নির্মাণ সম্ভব হয়নি। বৈচিত্র্যের কারণেই কোন সর্বস¥œত 'গোষ্ঠীতত্ত্ব' বা 'গোষ্ঠী মডেল'-এর মাধ্যমে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস ভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। তবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে মতৈক্য থাকলেও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে হলে গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকাকে কোনওভাবে অস্বীকার করা যায় না। একারণেই সমাজবিজ্ঞানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী/স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও কার্যকলাপের ওপর বহু গবেষণা হয়েছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরে এই ধরনের গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসমূহ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে শুরু হয়। লক্ষ্যণীয় যে, যে দেশে সরকার-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই দেশগুলিই রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংক্রান্ত চর্চাসমূহ বিশ্লেষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়।

২৮.২ গোষ্ঠী রাজনীতি ঃ ঐতিহাসিক সূত্র

(Gierke)

(Meitland)

(G.D.H. Cole) (Harold Laski)

(Glamplwicz)

(Zimmel)

(Arthur Bently)। যদিও এক্ষেত্রে বেন্টলির সহকর্মী জন ডিউয়ি (John Dewey)-র নামও উল্লেখ করা যেতে পারে তবে ১৯০৮ সালে বিখ্যাত গ্রন্থ (The Process of Government)-এ বেন্টলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবর্গের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এক "সুসংহত অনুসন্ধান" করতে সমর্থ হন। গঠনমূলক সমালোচনার ভিত্তিতে লিখিত এই গ্রন্থে বেন্টলি গতানুগতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের রীতি-নীতির বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' করেন। দৃষ্ট মনের আচরণের মাধ্যমেই একমাত্র রাজনীতি বিশ্লেষণ সম্ভব—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বেন্টলি গোষ্ঠীক্রিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই গোষ্ঠীভিত্তিক প্রক্রিয়াকে বেন্টলি "আদান-প্রদান" (transactions)-এর ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেন। তবে ঐ গ্রন্থে বেন্টলি "আদান-প্রদান" সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেননি।

বেন্টলি গোষ্ঠী রাজনীতির "বৃহত্তর প্রক্রিয়ার" ওপর জোর দিলেও, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিশ্লেষণে চাপসৃষ্টিকারী/স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কেন্দ্রবিন্দুতে আসে, ফলে বৃহত্তর প্রক্রিয়ার বদলে এক নির্দিষ্ট বা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আলোকপাত করা শুরু হয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ জননীতি বা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন বা কার্যকলাপের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা আলোচিত হতে থাকে।

২৮.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তা আরও জোরদার করতে বা অন্তত অপরিবর্তিত রাখতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে ঐ গোষ্ঠী (সমূহ) সমাজ সংগঠন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও একটি বিশেষ অংশ বাস্তবায়িত করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান কায়েম করতে চায়। **বর্তমান যুগে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর গুরুত্ব এতই বেড়েছে যে বলা হয় এদের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে রাজনীতি এক বৃহত্তর প্রক্রিয়া থেকে একক বিষয় (Single issue)-ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হচ্ছে।**

২৮.৪ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ শ্রেণীবিভাজন

(১ (Sectional Group);

(২) (Promotional Group)

¥¤

/

/ (Green peace)

২৮.৫ ক্ষমতার নির্দেশক

২৮.৫.১ অথ

সদস্যপদ

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা নীতি প্রণয়নকারীদের কাছে গোষ্ঠীর বক্তব্য পৌঁছে দিতে ঐ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা, বিশেষ করে সক্রিয় সদস্যদের সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। এক ধরনের মূল্যবোধ, নীতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সদস্যরা সংখ্যায় বেশি হলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর দাবীকে সরকার সহজে উপেক্ষা করতে পারে না।

মতাদর্শ ও লক্ষ্য

কোনও গোষ্ঠীর মতাদর্শ সরকারি চিন্তাভাবনার পরিপন্থী হলে ঐ গোষ্ঠীর ক্ষমতা যেমন কমার সম্ভাবনা থাকে তেমনি কোনও গোষ্ঠীর মতাদর্শ সরকারের কাছে বিপজ্জনক মনে না হলে সে গোষ্ঠীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

জনমানসে ধারণা

কোনও গোষ্ঠীর ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে যদি ঐ গোষ্ঠী সম্পর্কে জনমানসে সাধারণভাবে এক সদর্থক ধারণা থাকে। সাধারণত যে গোষ্ঠী জনসাধারণের কাছে ক্ষমতা পায় সরকারও সে গোষ্ঠীর বক্তব্য উপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে, কোনও গোষ্ঠী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকলে সে গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও গুরুত্ব কমে যায়।

২৮.৬ উপসংহার

রাজনীতিতে গোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণের সঙ্গে বহুত্ববাদের প্রত্যক্ষ যোগের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্তি হল, সমাজে নানা গোষ্ঠীর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে গোষ্ঠীগুলি রাজনীতিতে এক ধরনের "প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য" ও গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল তৈরিতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে কোনও এক বিশেষ স্বার্থ বা গোষ্ঠী আধিপত্য জারি করতে পারে না, ফলে ঐ ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা হয়। আবার এই ভারসাম্য এমন হয় না যার ফলে প্রত্যেক গোষ্ঠীই সমানভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত নয়া দক্ষিণপন্থী (New Right) চিন্তাধারা অনুসারে বলা হয়, সরকারি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া সরকার, মালিকগোষ্ঠী ও ইউনিয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অন্য গোষ্ঠীসমূহের এই ত্রিমুখী কাঠামোয় যোগ দেওয়ার "ক্ষমতা নেই"। সুতরাং বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বিতর্কিত উপাদান।

২৮.৭ অনুশীলনী

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। গোষ্ঠীরাজনীতি বিশ্লেষণে যে-কোনও চারজন পথিকৃতের নাম উল্লেখ করুন।

২। আর্থার বেন্টলি প্রণীত গ্রন্থের নাম কী?

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে গিয়র্ক ও মেইটল্যান্ডের বক্তব্য কী?

২। গোষ্ঠী রাজনীতিকে বেন্টলি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

১। বিভাগীয় ও মতপ্রচারকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

২। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতার নির্দেশসমূহ উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

২৮.৮ উপসংহার

১। D. L. Sillsed : International Encyclopedia of Social Sciences, Vols. 11 + 12, 1962, pp. 241-245.

২। A. Grant : The American Political Process (Dartmouth), 1994.

৩। G. A. Almond and G. B. Powell, Jr. : Comparative Politics (New Delhi), 1972, pp. 74-79.

□

২৯.০ উদ্দেশ্য

২৯.১ প্রস্তাবনা

২৯.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়ন

২৯.৩ রাজনীতিক উন্নয়ন আলোচনার পটভূমি

২৯.৪ রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

২৯.৫ রাজনীতিক উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

২৯.৫.১ রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে **Almond**-এর দৃষ্টিকোণ

২৯.৫.২ রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কে **Lucian Pye.**

২৯.৬ ভারতে রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

২৯.৭ উপসংহার

২৯.৮ অনুশীলনী

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক পরিবর্তনের সাথে রাজনীতিক উন্নয়নের পার্থক্য।
- আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং রাজনীতিক উন্নয়নের সাথে এর সম্পর্ক।
- রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলি কী?
- ভারতে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারাটি কেমন?

সমাজতত্ত্ব চর্চার সমৃদ্ধি ও বিশেষীকরণের ফলে এর নানা শাখা গড়ে উঠেছে, যেমন অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি। এইসব নানা শাখার সমাজতত্ত্ব সমাজ জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকের গতিপ্রকৃতি, উন্নয়ন-পরিবর্তন বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। অর্থনীতিক সমাজতত্ত্ব, যেমন সমাজের আর্থিক উন্নয়ন-পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী তেমনি রাজনীতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন

প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম উপজীব্য। তবে মনে রাখা দরকার 'পরিবর্তন' ও 'উন্নয়ন' নামক ধারণা দু'টি সমার্থক তো নয়ই, বরং তা স্পষ্টতই পৃথক পৃথক অর্থের সূচক। তাই রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয় দু'টি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিকীকরণ (modernization) নামক ধারণাটিও বিশেষ উল্লেখ্য। আধুনিকীকরণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন এক সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে—নগরায়ণ, শিল্পায়ন, গণসংযোগ ব্যবস্থার বিকাশ-বিস্তার ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে এবং একযোগে ঘটানো। ফলে সমাজের সাবেকি জীবনধারার বদলে এক প্রবল আত্মবিশ্বাসী ও গতিশীল জীবনধারার সূচনা করে।

রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাকে ঘিরে অবশ্য বিশ্লেষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য যথেষ্ট। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার চারিত্রলক্ষণ নিয়ে তাই সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতানৈক্য বর্তমান। তবে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের বিষয়ে তাদের ঐকমত্যও লক্ষ্যণীয়। এইসব সাধারণ লক্ষণগুলির নিরিখেই ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে রাজনীতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গটি এখানে আলোচিত হল।

'পরিবর্তন' ও 'উন্নয়ন' শব্দ দু'টি আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও বিশদ বিশ্লেষণে ও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। পরিবর্তন মূলত একটি ঘটনা বা ক্রিয়া; যার ফলে সমাজে কোনও-না-কোনও রকমের রূপান্তর চোখে পড়ে। উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া, এক গতিশীল প্রক্রিয়া। উন্নয়নের অর্থ অবশ্যই এক ধরনের পরিবর্তন; কিন্তু তাই বলে যে-কোনো পরিবর্তনই 'উন্নয়ন' বলে বিবেচিত হয় না। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ইতিবাচক বিকাশ বা সমৃদ্ধিকেই কেবল রাজনীতিক উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনীতিক পরিবর্তন যতটা মূল্যমান-নিরপেক্ষ, রাজনীতিক উন্নয়ন কিন্তু তা নয়। উন্নয়নের মধ্যে অগ্রগতি বা প্রগতির ধারণা নিহিত। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাসের পূর্বতন সরলমাত্রিক (linear) স্তর থেকে বিশেষীকৃত (diversified) সমৃদ্ধতর স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়াকেই রাজনীতিক উত্তরণ বলে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ যা ছিল তার চেয়ে কতটা ভালো হল, কী পরিমাণ অগ্রগতি হল সেটাই এখানে আসল বিবেচ্য। এর ফলে সমাজের সাবেকি গঠন ও জীবনধারা ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়।

উপরন্তু, রাজনীতিক পরিবর্তন যতখানি সহজে অনুধাবনযোগ্য ও স্বীকৃত, রাজনীতিক উন্নয়ন ততখানি সহজে অনুধাবনযোগ্য নয় এবং তাকে ঘিরে বিরোধ-বিতর্কও রীতিমতো প্রবল। কোনও এক ব্যাপক গণবিক্ষোভের মাধ্যমে অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি দেশের শাসক পরিবর্তন হলে তাকে রাজনীতিক পরিবর্তন বলে স্বীকার করতে কারুরই কোনও আপত্তি থাকবে না। কিন্তু রাজনীতিক উন্নয়ন কথাটির মধ্যে মূল্যমানের প্রশ্ন জড়িত বলেই কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থায় যে রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তা, উন্নয়ন বা অবনয়ন এ নিয়ে মতভেদ ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

উন্নয়নের সাথে যেহেতু সমৃদ্ধি ও উত্তরণ ইত্যাদি মূল্যমানসূচক ধারণা সম্পৃক্ত তাই স্বভাবতই একে ঘিরে নানা দৃষ্টিভঙ্গীগত বিষমতা ও বিতর্ক বর্তমান। তাই 'উন্নয়ন' ধারণাটির কোনও সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভভব নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। উদারনীতিক গণতন্ত্রবাদী চিন্তাবিদ্ ও মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ্দের মধ্যে এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল

মতপার্থক্য বর্তমান। এমনকি উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদ্‌রাও ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ-প্রেক্ষিত থেকে উন্নয়নের প্রসঙ্গটিকে বিচার করেছেন। তবু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, সমাজের সাবেকি জীবনধারা ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি যখন জটিলতর বিভাজন-বিন্যাস ক্রম-রূপান্তরিত হয় তার এই জটিলতাজাত সঙ্কট ও দাবীদাওয়া সমাধানে সক্ষম অধিক কার্যকর ও বিশেষীকৃত রাজনীতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার বিবর্তনকেই রাজনীতিক উন্নয়ন নামে অভিহিত করা যায়।

রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণার উদ্ভব ও ঐ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে। সদ্যবিগত বিশ শতকের মধ্যভাগে যখন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দ্রুত বিপর্যয়ে হীনবল হয়ে পড়ে এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের নানা দেশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সংহত অগ্রগতির প্রয়াস শুরু করে; সদ্য স্বাধীন এইসব দেশের কর্ণধার ও পরিকল্পনাবিদ্‌রা উন্নয়নের নানা প্রকল্প ও প্রতিরূপ পরীক্ষামূলকভাবে উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। ফলত এই সময় উন্নয়ন বা বিকাশের ধারণাগত আলোচনা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, রাজনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশের ধারণাটি প্রধানত এইসব অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ ও জাতির পরিপ্রেক্ষিতেই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিশ শতকের পাঁচের দশকে মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ঠান্ডাযুদ্ধের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলি মুক্ত হতে পারে নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিরূপতা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সম্পর্কে আগ্রহ সত্ত্বেও এই দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক বিচিত্র টানাপোড়েন অনিবার্য হয়ে ওঠে। পশ্চিমী শিল্প-প্রযুক্তির ধাঁচে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদকে অগ্রাহ্য করা গেল না। আর এই ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন সমাজে বেশ কিছু মাত্রায় শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আনুষঙ্গিক সামাজিক রূপান্তর ঘটল। এইরকম আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে অনিবার্য হয়ে উঠলো রাজনীতিক রূপান্তর ও উন্নয়ন। তাই তৃতীয় বিশ্বের এইসব উন্নয়নেচ্ছু দেশগুলির উপর নানা সমীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার দায়ভার প্রথমদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার উপরই বেশি বর্তেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনোযোগের বিষয়টি হল এইসব উন্নয়নকামী দেশের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনধারার পাশাপাশি রাজনীতিক উন্নয়ন বা রূপান্তর কীভাবে, কতখানি এবং কোন্ পথে সাধিত হয়েছে? বলা বাহুল্য, উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নয়নশীলতার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে; তেমনি এদের উন্নয়নের ধারাও সমগোত্রীয় নয়। আবার সব দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর রাজনীতিক রূপান্তরের সাথে সাযুজ্য বজায় রাখেনি। আর এইসব কারণেই রাজনীতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিত থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নতুন এক আলোচনা শাখার উদ্ভব ঘটেছে যাকে 'তুলনামূলক রাজনীতি' নামে অভিহিত করা হয়।

আধুনিকীকরণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন এক সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া যার ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ হল নগরায়ণ, শিল্পায়ন, যন্ত্রায়ন ইত্যাদি বাহ্য প্রক্রিয়া। এইসব বাহ্যিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে যুক্তিবাদী

ভাবধারা, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ইত্যাদি ভাবগত উপাদান যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় এক সার্বিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া যাকে কেউ কেউ ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রতিরূপ বলে মনে করেন। আর রাজনীতিতে এই আধুনিকীকরণের প্রতিফলন ঘটে উদারনীতিবাদী ভাবধারা, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে।

ঔপনিবেশিক পর্বে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রয়োজনে এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমাজ-অর্থনীতির স্তরে আধুনিকতার বাহ্য প্রক্রিয়াগুলির সূত্রপাত হয়েছিল, যদিও সেইসব প্রক্রিয়া ছিল খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেতনায় মুখ্য প্রবণতাই ছিল এইসব শুরু হওয়া প্রক্রিয়ার প্রান্তিক কিছু পরিমার্জনাসহ সেগুলিকে সংহত ও ত্বরান্বিত করা। ঔপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠনে জীর্ণ সমাজ-অর্থনীতির পুনর্গঠন ও দ্রুত অগ্রগতি বা উন্নয়নের লক্ষ্যে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পপ্রযুক্তি, নগরায়ণ ইত্যাদি আধুনিকীকরণের বাহ্য প্রক্রিয়াগুলিকে অনুসরণ করেছেন। সমাজ-অর্থনীতিতে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে। আর রাজনীতিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রতিভাত হয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, যেমন ঃ (ক) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শাসন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবেকি গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম কিংবা পরিবারভিত্তিক শাসনের অবসান ঘটে। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক কর্তৃত্ব। (খ) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের ফলে দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। (গ) আধুনিকীকরণের ফলে রাজনীতিক কাজকর্মে বিভক্তিকরণ (differentiation) ও বিশেষীকরণ (specialization) ঘটে। (ঘ) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের প্রভাবে রাজনীতিতে প্রতিনিধিমূলক ও দলভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে এবং বৃদ্ধি পায় নানা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। (ঙ) আধুনিকীকরণের প্রভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা সংযোগ-মাধ্যমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখা দরকার যে, ইউরোপে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সংস্কার আন্দোলন, স্বৈরতন্ত্রবিরোধী গণবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদি। সমাজের রাজনীতিক স্তরে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জন্ম দিয়েছিল গণতান্ত্রিক আদর্শ, শুরু করেছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহের। তাই ইউরোপীয় ধারার আধুনিকীকরণ সমাজ-অর্থনীতিতে যেমন নগরায়ণ, শিল্পায়ন বা যন্ত্রায়নের সূচনা করেছে তেমনি রাজনীতিতে গড়ে তুলেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও রীতিনীতি, নৈর্ব্যক্তিক আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, কৌমকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার বদলে আধুনিক সিভিল সোসাইটির বিকাশ ইত্যাদি। তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশের সমাজ-অর্থনীতিতে যেমন নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার ইত্যাদি বহির্লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোথাও কোথাও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-পদ্ধতি ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু পশ্চিমী আধুনিকতার সাথে তৃতীয় বিশ্বের এই আধুনিকীকরণকে সমগোত্রীয় বা সমধর্মী মনে করা সমীচীন নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ইউরোপে মধ্যযুগীয় সাবেকি ঐতিহ্যের ক্রমিক অপসারণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক পূর্ণাঙ্গ আধুনিক সমাজ। সেখানে চিরাচরিত বিশ্বাসের স্থান নিয়েছে যুক্তি, কর্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দায়বদ্ধতা, উৎপাদনকে সচল করেছে উদ্ভাবনী ক্রিয়াকলাপ, গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র আনুগত্যের জায়গায় জেগেছে জাতীয় মর্যাদাবোধ আর ব্যক্তি-মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে সবকিছুর কেন্দ্রে।

অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আধুনিকতা সাবেকি সমাজের অন্তঃস্থল থেকে গড়ে না উঠে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তির দ্বারা উপর থেকে আরোপিত। তাই এখানে সাবেকি ঐতিহ্যের অবসানের বদলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক কৌতুকময় মিশ্রণ ঘটে যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ' (Modernization of tradition) বলে অভিহিত করেন। এখানে ব্যক্তি কদাচিৎ গোষ্ঠীর ওপরে স্থান করে নিতে পারে; যুক্তির আঘাতে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল দুর্বল হতে সময় লাগে অনেক। পুরানো উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে নতুন প্রযুক্তি দিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো বেশ কঠিন কাজ। অনেকাংশে পশ্চিমের অনুকরণেই আধুনিকতা আসে।

ফলত পশ্চিমী আধুনিকতা যে ধরনের ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিমানস গঠনের সহায়ক, তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারায় সমজাতীয় ব্যক্তিমানস সৃষ্টি হতে পারে না। Daniel Larner, David Maccleland, Everett Hagen, Alex Inkeles প্রমুখ লেখকরা আধুনিক মানুষের (Modern Man) যে চারিত্রলক্ষণের কথা বলেছেন তার হদিশ তৃতীয় বিশ্বের আধুনিক সমাজে তেমন সহজলভ্য নয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ক ধারণাগত ও তত্ত্বগত আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের অর্ধোন্নত বা উন্নয়নেচ্ছু দেশগুলির উন্নয়নমূলক প্রয়াসের প্রসঙ্গে। তবে, প্রধানত অগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাগত প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। মুখ্যত, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব বা ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত নানা বিশ্লেষণ ও একাধিক মডেল তুলে ধরেছেন Edward Shils, Lucian Pye, Samuel Huntington, Daniel Larner, David Apter, Almond ও Powell প্রমুখ বহু সমাজবিজ্ঞানী।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, রাজনীতিক জীবনধারা, কাঠামো-কার্যাবলী ও প্রক্রিয়ার সাবেকি সরল পর্যায় থেকে জটিলতর, বিশেষীকৃত আধুনিক পর্যায়ে উত্তরণকেই রাজনীতিক উন্নয়ন নামে অভিহিত করা যায়। একথাও মনে রাখা দরকার যে রাজনীতিক উন্নয়ন হল সরকার প্রভাবিত ও পরিকল্পিত সুচিন্তিত পরিবর্তনের কার্যক্রম ও তার আনুষঙ্গিক ধারা।

রাজনীতিক উন্নয়নের পশ্চিমী আলোচকরা মূলত এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে, পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলিই বিশ্বের অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে রাজনীতিক উন্নয়নের মানদণ্ড স্থাপন করেছে যা তারা সচেতন বা অসচেতনভাবে অনুসরণ করে চলে। এই প্রত্যয়ে স্থিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে Karl Deutsch, Daniel Larner, Edward Shils এবং Rostow ও Pye-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিন্তাবিদ্‌রা প্রায় সকলেই রাজনীতিক উন্নয়নশীলতার অন্যতম প্রধান চারিত্রলক্ষণ হিসেবে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করেছেন। Rostow ও Pye-এর মতে, রাজনীতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হল জাতীয় ঐক্য ও রাজনীতিক অংশগ্রহণের পরিসরের বিস্তৃতিসাধন। Edward Shil-ও রাজনীতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসেবে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে Everett Hagen, Eisenstadt, G.A. Almond প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিক উন্নয়নের বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হল, বিকাশমান দেশের আর্থ-সমাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার ফলে সমকালীন সমাজজীবনে যে জটিলতা ও সমস্যাদির সৃষ্টি হয় তাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে রাজনীতিতে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ও প্রক্রিয়া পদ্ধতি গড়ে ওঠে তাকে রাজনীতিক উন্নয়ন বলে অভিহিত করা যায়। Hagen যেমন রাজনীতিক উন্নয়ন বলতে বুঝিয়েছেন "growth of institutions & practices that allow a political system to deal with its own fundamental problems more effectively". তেমনই একই জাতীয় মন্তব্য করে Eisenstadt রাজনীতিক উন্নয়নকে বলেছেন "the ability of a political system to sustain continuously new types of political demands & organisations". রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কে প্রায় হুবহু একই সুরে কথা বলেছেন Alfred Diament.

তবে রাজনীতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরোক্ত আলোচনায় দেবার চেষ্টা করা হলেও দু'টি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিকোণকে আরও একটু বিশদভাবে দেখা যেতে পারে।

২৯.৫.১ রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে Almond-এর দৃষ্টিকোণ

Gabriel Almond বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহকে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক—প্রধানত এই দু'টি ভাগে ভাগ করলেও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি পরিবর্তনশীল পর্যায়ের (Transitional) ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বিভাজন প্রয়াস যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা হল, একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবিলার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা অপেক্ষা আধুনিক ব্যবস্থা অধিকতর 'দক্ষ'। রাজনীতিক ব্যবস্থায় দক্ষতা বা 'সামর্থ্য' বলতে বিদ্যমান পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। Almond-এর মতে, রাজনীতিক ব্যবস্থার এই দক্ষতা বা সামর্থ্য তিনটি পর্যায়ের কার্যাবলীর দ্বারা যাচাই হয়--(ক) রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কার্যাবলী, (খ) পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলী ও (গ) অভিযোজনমূলক কার্যাবলী।

Almond ও Powell বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক উন্নয়নধারাকে বিচার করতে গিয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির উপর। এদের বিশ্লেষণে রাজনীতিক উন্নয়নের চারটি মূল সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে : (১) রাষ্ট্রিক গঠন (State building), (২) জাতিগঠন (Nation building), (৩) রাজনীতিক অংশগ্রহণ (Political Participation) এবং (৪) বণ্টন ও কল্যাণসাধন (Distritution & Welfare)।

রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নতুন নতুন কাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রচলিত কাঠামোগুলির মধ্যে বিভক্তিকরণ ও বিশেষীকরণের ব্যবস্থা করাই হল রাষ্ট্রগঠন। সাবেকি রাষ্ট্রব্যবস্থা সরলমাত্রিক সংগঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ঐসব দেশের আর্থসামাজিক পটভূমিতে ধীরে ধীরে যেসব রূপান্তরজাত জটিল সমস্যাদির সৃষ্টি হয় তার সমাধানের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় স্তরে

নানা বিশেষীকৃত সংগঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সাবেকি সমাজের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনসমূহের কর্তৃত্বের প্রান্তসীমাতেও রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার প্রসারিত হয় এইসব নবোদ্ভূত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই রাষ্ট্রগঠনের এই প্রক্রিয়াকে অনেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Institution Building) বলেও অভিহিত করেন।

রাজনীতিক উন্নয়নের আর এক পরিপূরক দিক হল জাতিগঠন। সাবেকি সমাজের জনসমষ্টির মধ্যে জাতিগত সংহতি দুর্বল ও শিথিল। ব্যক্তির জাতিগত আনুগত্য-চেতনার চেয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠীগত, কৌমগত বা সম্প্রদায়গত আনুগত্য চেতনা প্রবলতর হয়। লক্ষ্যণীয় হল, রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক হলেও উভয়ের মধ্যে সমান সাযুজ্য বহু সময়েই রক্ষিত হয় না।

রাজনীতিক উন্নয়নের আর এক প্রায় অনিবার্য বিশেষত্ব হল রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি। নানা রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণ তাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের দাবী জোরদার করে তোলে। এইসব দাবীদাওয়ার চাপে সরকারও বাধ্য হয় রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে ও তাকে সম্প্রসারিত করতে।

আর রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথেই আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক সুযোগসুবিধার অপেক্ষাকৃত সুষম বণ্টন ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র নানা কল্যাণধর্মী কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণে আগ্রহী হয়, অথবা বাধ্য হয়।

২৯.৫.২ রাজনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে Lucian Pye

রাজনীতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে Lucian Pye-এর ধারণা পরিচিতি লাভ করেছে উন্নয়নের লক্ষণগুচ্ছ (Development Syndrome) নামে। উন্নয়নের প্রধান লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি যে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলি হল সমতা (Equality), সামর্থ্য (Capacity) এবং বিভক্তিকরণ (Differentiation)।

রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ এবং রাজনীতিক কাজকর্মের সাথে সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টিকেই অধ্যাপক Pye সমতা বলে উল্লেখ করেছেন। একেই সক্রিয় নাগরিকতা (Active Citizenship) বলে অভিহিত করা হয়। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এমন এক রাজনীতিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে যেখানে সাবেকি সমাজের বিভেদ-বৈষম্যের বদলে আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় চারিত্রলক্ষণ হিসেবে যে সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে তার সহজ অর্থ হল পরিবর্তমান সমাজ-অর্থনীতিক বাস্তবতাকে মোকাবিলা করার, নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা। উন্নয়নশীল রাজনীতিক ব্যবস্থার এই সক্ষমতা সৃষ্টি হয় রাজনীতিক কাঠামোর নতুন নতুন বিভাজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সক্ষমতার বিচার করা যায়। তাই অধ্যাপক Pye-এর মতে, সরকারের কাঠামোসমূহের কার্য সম্পাদনের উপর রাজনীতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য নির্ভর করে।

রাজনীতিক উন্নয়নের তৃতীয় চারিত্রলক্ষণ হল বিভাজনকরণ বিশেষীকরণ। (Differentiation Specialization)। অনগ্রসর অর্থনীতি থেকে অগ্রসর শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগের যে ভূমিকা উন্নয়নশীল রাজনীতিক ব্যবস্থায় কর্মগত বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণের ভূমিকাও সমতুল। একটি অনগ্রসর রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমিক অগ্রগতির পথে এগোতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণের অনিবার্যতাকে এড়াতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করে অধ্যাপক Pye বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমতা, সামর্থ্য, ও বিভক্তিকরণের যে ত্রিমাত্রিক লক্ষণগুচ্ছ, তারা যে পরস্পরের সাথে নিশ্চিতভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ তা নয়; বরং ঐতিহাসিকভাবে এগুলির মধ্যে রীতিমতো টানাপোড়েন বর্তমান। ("In recognising these three dimensions of equality, capcity & differentiation as lying at the heart of the development process we do not mean to suggest that they necessarily fit easily together. On the contrary, historically the tendency has been that there are acute tensions between the demands for equality, the requirements for capacity & the process of great differentiation".)

অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মতো ভারতেও আধুনিকীকরণ ও রাজনীতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে আধুনিক নগর-জীবনের সূচনা হয়; সীমিত মাত্রায় হলেও সূত্রপাত হয় আধুনিক ধারার শিক্ষাসংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার, শুরু হয় প্রযুক্তি প্রয়োগের বিক্ষিপ্ত প্রসার। আধুনিক সড়ক পরিবহন, রেলপথের প্রচলন, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থার প্রসার, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে দেশী-বিদেশী ভাষার সংবাদপত্রের প্রকাশ ইত্যাদি আমাদের সাবেকি সমাজ, অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে নানা রূপান্তর সাধন করতে থাকে; জন্ম নেয় নতুন নতুন সামাজিক শক্তি; শুরু হয় সমাজ-রাজনীতিক চেতনায় নানা আন্দোলনের ধারা।

ঔপনিবেশিক পর্বের এইসব আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ও তার থেকে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক রূপান্তর শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রসারিত ও বেগবান করেছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, এই জাতীয়তাবদী চেতনা ইউরোপীয় ধারার আধুনিকতাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে শুধু অপারগই ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছুকও ছিল। সাবেকি ঐতিহ্যের ক্রমিক অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে আধুনিকতার বোধন ঘটেনি এখানে; বরং ঘটেছে সাবেকি ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ (modernization of tradition)—যার মধ্যে অনেক আপাত-অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা রীতিমতো প্রবল।

এরই পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বিচার করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী বিচার করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যেটুকু সীমিত রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ ভারতীয়দের দিয়েছিল তা আধুনিক শাসনপ্রণালী ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দেশীয় উচ্চবর্গীয়দের কিছু পরিমাণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ করে তুলেছিল।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে এই এলিট সম্প্রদায় রাজনীতিক উন্নয়নের ধারাকে প্রধানত উদারনীতিবাদী মতাদর্শের প্রেরণায় এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়। ভারতীয় সমাজে বাস্তবের উপযুক্ত অথচ আধুনিক জাতি গঠনের সহায়ক একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্বেষণ এজন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বিপুল বৈচিত্র্যে ভরা ভারতের সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনধারায় এক বহুত্ববাদী প্রতিনিধিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও বিধিব্যবস্থা ছিল প্রায় অপরিহার্য। Almond-কথিত রাষ্ট্রগঠনের ও জাতিগঠনের কথা মাথায় রেখেই ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৪৯-এর শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রকল্পগুলির সন্নিবেশ ঘটান। এর ফলে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের ব্যাপকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বলা বাহুল্য ক্রমপরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন দাবীদাওয়া ও সঙ্কটগুলির মোকাবিলার ভারতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে তার সামর্থ্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। মনে করা হয়, এই সামর্থ্য বা দক্ষতা অর্জিত হয়েছে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমাগত বিভক্তিকরণ ও বিশেষীকরণের মাধ্যমে।

তুলনামূলক রাজনীতি চর্চায় এবং রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজনীতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি। আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও 'রাজনীতিক পরিবর্তন' ও 'রাজনীতিক উন্নয়ন' দু'টি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। সমস্ত রাজনীতিক পরিবর্তন রাজনীতিক উন্নয়ন বলে বিবেচিত হয় না।

রাজনীতির উন্নয়নের সাথে আধুনিকীকরণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত, ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বহু অনগ্রসর রাষ্ট্র-রাজনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। রাজনীতিক উন্নয়নধারার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ এইসব দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

রাজনীতিক উন্নয়নকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকরা আলোচনা করলেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই বলেছেন। রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে এবং বিশেষত সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গণ-অংশগ্রহণ, রাজনীতিক বিধিবিধানের সমতা, ক্রমপরিবর্তমান সমাজের নতুন নতুন দাবীদাওয়া, দ্বন্দ্বসংকট ইত্যাদি সমাধানে রাষ্ট্রব্যবস্থার দক্ষতা বা সামর্থ্য এবং রাজনীতিক কাঠামোর সাংগঠনিক বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণ বৃদ্ধি—রাজনীতিক উন্নয়নের সাধারণ লক্ষণ বলে স্বীকৃত।

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য কী?

২। রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

৩। আধুনিকীকরণ ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ' ধারণাটি কী?

৫। রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে Almond-এর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করুন।

৬। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে Lucian Pye-এর মতামত আলোচনা করুন।

৭। ভারতের রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া বিষয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

১। G. A. Almond & G. B. Powell : Comparative Politics

২। Ali Ashraf & L. N. Sharma : Political Sociology

৩। J. C. Johari : Comparative Politics

৪। Samuel Huntington : Political Order in a Changing Society

৫। মৃণালকান্তি ঘোষদস্তিদার : রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞান

□

৩০.০ উদ্দেশ্য

৩০.১ প্রস্তাবনা

৩০.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন

৩০.৩ রাজনীতিক পরিবর্তনের কারণ (উৎস)

৩০.৩.১ রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসগত উপাদানসমূহ

৩০.৪ রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

৩০.৪.১ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান

৩০.৪.২ বিপ্লব

৩০.৫ রাজনীতিক পরিবর্তন : মতাদর্শের ভূমিকা

৩০.৬ সারাংশ

৩০.৭ অনুশীলনী

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের পার্থক্য।
- রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রধান উৎসগুলি কী?
- রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।
- রাজনীতিক পরিবর্তন হিসেবে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য।
- রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা।

সামাজিক রূপান্তরের মতোই রাজনীতিতেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের এক বিরামহীন প্রক্রিয়া বর্তমান। রাজনীতির এই গতিশীল পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মূলে আছে সমাজের পরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

পরিস্থিতি। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের নানা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া হিসেবেই রাজীনতিতে প্রতিনিয়ত নানা পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে বা ঘটানো হয়। সমাজের এই পরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় বা উপাদানগুলো বহু ও বিচিত্র। যেমন, আর্থনীতিক উৎপাদনধারার পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের পরিবর্তন, জনসংখ্যাগত ও অভিবাসনগত (migration) পরিবর্তন, নগরায়ণ জনিত পরিবর্তন, নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণীসমূহের উদ্ভবগত পরিবর্তন, শিক্ষাসংস্কৃতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা বা নিয়োগগত পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন ইত্যাদি। এই সমস্ত নানা পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে রাজনীতিক সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, রাজনীতির সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগত বিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পরিবর্তনের বা রূপান্তরের রূপ, প্রক্রিয়া ও প্রকরণ, বলা বাহুল্য, সবক্ষেত্রে একরকম নয়। রাজনীতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া কখনো যেমন ক্রমিক সংস্কারপন্থী কখনো তা আবার আমূল সংশোধনপন্থী ও আকস্মিক; কখনো যেমন সীমিত বা খণ্ডিত কখনোবা তা ব্যাপক; কখনো যেমন তা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক কখনো তা আবার সহিংস ও রক্তক্ষয়ী।

বিপ্লব, বলা বাহুল্য, এক বিশেষ ধরনের সমাজ-রাজনীতিক পরিবর্তন যার প্রক্রিয়া-প্রকরণ অন্যান্য ধারার পরিবর্তন থেকে মূলত এবং স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। এই পরিবর্তন আমূলপন্থী ও চরমপন্থী তো বটেই, এবং সেই কারণেই এর ব্যাপ্তি ও গভীরতা সমাজজীবনকে অনেক বেশি মাত্রায় উৎক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করে। রাজনীতিক পরিবর্তন হিসেবে বিপ্লবের এই স্বতন্ত্রময় প্রকৃতি ও ভূমিকার জন্য বিপ্লব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাত্ত্বিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করেছেন।

সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর-নিরপেক্ষ তো নয়ই, বরং উভয়ে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এই পারস্পরিক সাপেক্ষতাই রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology)-র কেন্দ্রীয় ধারণা।

সমাজ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কোনও জনগোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে-ওঠা নিবিড়, বিচিত্র ও জটিল সম্বন্ধজাল। স্বভাবতই এই জটিল সম্বন্ধজাল থেকে জন্ম নেয় কিছু প্রয়োজনীয় কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান এবং আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা। মানুষের গতিশীল জীবনধারায় এই পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি পরিবর্তন ঘটে এইসব কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিধিব্যবস্থার। সামগ্রিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীর এই সমুদয় রূপান্তরকেই আমরা সামাজিক পরিবর্তন বলে অভিহিত করতে পারি।

সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপকে আর একভাবে কেউ কেউ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মানবদেহের অভ্যন্তরে অবিরাম নানা রাসায়নিক রূপান্তর বা metabolism ঘটে, ফলশ্রুতিতে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেমনি সমাজদেহের অভ্যন্তরে যে অবিরাম নানা পরিবর্তন ঘটে চলে তাকে Social metabolism বা সমাজদেহের রাসায়নিক রূপান্তর বলা যেতে পারে।

রাজনীতি হল সমাজের সুসংগঠিত ও বৈধতাপূর্ণ কর্তৃত্বকাঠামো ও তার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট সমাজ-অর্থনীতির পটভূমিকে বাদ দিয়ে কোনও রাজনীতি—অর্থাৎ এই বৈধতাপূর্ণ কর্তৃত্ব-কাঠামোর বিন্যাস ও বিধিব্যবস্থাকে ও তার গতিপ্রকৃতিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা যাবে না। অন্যদিক থেকে বলা যায়, রাজনীতি ও রাজনীতিক পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই সমাজ-অর্থনীতির সাথে ও তার পরিবর্তন-প্রবাহের সাথে অন্বিত। কিন্তু রাজনীতিক পরিবর্তন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে যত নিবিড়ভাবেই সম্পর্কিত হোক না কেন রাজনীতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন দু'টি সমার্থক ধারণা নয়। সমগ্র সমাজজীবনকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করলে রাজনীতিকে ঐ ব্যবস্থার 'উপব্যবস্থা' (Sub-system) বলে ধরা যেতে পারে।

রাজনীতিক অন্তর্নিহিত সত্তাটি প্রোথিত আছে মানবসমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পটভূমিতে। মানবসমাজের সুদূরতম অতীত থেকে অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত কোনও কালেই এই দ্বন্দ্বময় পটভূমির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। (মার্ক্স-কথিত আদিম সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কেও বিতর্কের অবকাশ বর্তমান)। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সামাজিক পটভূমি ও তৎসংশ্লিষ্ট আধিপত্য-অধীনতার প্রশ্নগুলি—যা সমাজে রাজনীতি নামক প্রক্রিয়া-প্রকরণের জন্ম দিয়েছে—এক চিরন্তন প্রবাহ হিসেবে সমাজে টিকে আছে। এই দিক থেকেই রাজনীতিকে সমাজের অন্তর্গত এক বিরামহীন স্রোত হিসেবে গণ্য করা যায়। তার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে এই স্রোতের ধারাবদল ঘটেনি। বরং প্রকৃতি সত্যটি হল, এই স্রোতের ধারাবদল ঘটেছে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে, নানাভাবে এবং এগুলোই বিভিন্ন মানবসমাজের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এককথায় তাই, রাজনীতি আর সমাজের চলমানতা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাজনীতির এই পরিবর্তনশীল ধারা নানা সামাজিক ও আর্থনীতিক উপাদানসমূহের ব্যাপক সমাহারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে স¥প্রবন্ধযুক্ত। ("Political change is intricately related to a wide Spectrum of social & economic factors"—Davies & Lewis : Models of Political Systems) । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও সমাজে যখন শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শিক্ষার বিস্তার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়া ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় নতুন মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও নতুন নতুন দাবীদাওয়া জন্ম নেয় আর এইসব প্রত্যাশা ও দাবীদাওয়াগুলির মোকাবিলায় এবং তার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে দেশে রাজনীতিক ব্যবস্থা তার নিজস্ব কাঠামোগত বিন্যাস ও পদ্ধতি-প্রকরণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন না করে পারে না। সচরাচর এই পরিবর্তন ক্রমান্বয়িক, ধীরগতিসম্পন্ন ও নিয়মতান্ত্রিক। কিন্তু এ কথা কখনো বলা যাবে না যে, দেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যেসব নতুন প্রত্যাশা ও দাবীদাওয়া জন্ম নেয় এবং দেশের রাজনীতিতে অভিঘাত সৃষ্টি করে, রাজনীতির প্রক্রিয়ায় তার সমানুপাতিক পরিবর্তনই সূচিত হয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাজনীতিক পরিবর্তনের গতিবেগ বা মাত্রা সমাজে গড়ে ওঠা চাহিদা ও দাবীদাওয়ার তুলনায় শ্লথগতি ও সীমিতমাত্রিক। বস্তুত, সামাজিক প্রত্যাশার সাথে তুলনায় রাজনীতি পরিবর্তনের বাস্তব গতির যে অসামঞ্জস্য বা ঘাটতি তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমাজের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ ইতস্তত বিদ্রোহ-বিস্ফোরণের ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ ঘটায়; আবার কখনোবা তা সুপরিকল্পিত

বিপ্লবের রূপ নেয়। এ কারণে আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, উন্নত রাজনীতিক ব্যবস্থার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল সমাজের গতিশীল প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব-সংঘাত আত্তীকরণ করার ক্ষমতা, এবং এই ক্ষমতাই ঐ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের বা ধারাবাহিকতার গ্যারান্টি। একে আমরা বলতে পারি 'পরিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা' (Continuity through change)।

৩০.৩.১ রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসগত উপাদানসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবসমাজে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বর্গ, সম্প্রদায় ইত্যাদির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎসভূমি থেকেই রাজনীতিক প্রক্রিয়া-প্রকরণ ও তার নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার জন্ম। স্বভাবতই রাজনীতিক পরিবর্তনের মূলেও রয়েছে এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল সমাজের গতিশীল প্রক্রিয়া যা অনিবার্যভাবেই রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে ও রাজনীতির প্রক্রিয়া-প্রকরণের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

সমাজের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুনই দেশের রাজনীতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়—সাধারণভাবে এ কথা বলা হলেও রাজনীতিক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কারণ হিসেবে কয়েকটি প্রধান উপাদানসূত্রের নির্দেশ করা হয়। Tom Bottomore এইরকম নির্দিষ্ট কয়েকটি উপাদানসূত্রকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন ধারার রূপান্তরকে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজের অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক উৎপাদনধারার রূপান্তর শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনধারাকে কেন্দ্র করে যে দু'টি মুখ্য শ্রেণী দুই পরস্পর-বিপরীত স্বার্থের সংঘাতে লিপ্ত হয়, তার পরিণতিতে সমাজে ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে যা অবশ্যম্ভাবীভাবেই রাজনীতিক পরিবর্তনের সূচনা করে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন ও বণ্টনধারা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করেই রাজনীতিক উপরি-কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন রাজনীতিক উপরি-কাঠামোর পরিবর্তন রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। শুধু রাজনীতিক উপরি-কাঠামোই নয়, অন্যান্য উপরি-কাঠামো, যেমন সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামোতেও পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় এই অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তরের দরুনই।

আবার রাজনীতিক পরিবর্তনের মূলে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক বিচার করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনকে এখানে কোনও শ্রেণীগত স্বার্থের মধ্যেকার সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা হয় না, দেখা হয় উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের বিপুল অগ্রগতি এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তজ্জনিত রূপান্তর হিসেবে। বিশেষত আধুনিক শিল্পসমাজের উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমিতে এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, অত্যাধুনিক যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমাজ-অর্থনীতিতে যে নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব হয়, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে নতুন নতুন প্রবাহ-প্লবতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি এসবের চাপে সামাজিক শক্তির যে নতুন গতিশীল ভারসাম্য গড়ে ওঠে তা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিরন্তর অভিঘাত সৃষ্টি করে।

আর একদিক থেকেও এই আধুনিক প্রযুক্তি রাজনীতিক বিধিব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী বিশ্বে এই বিপুল যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ-বিস্তার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন-বিনিময় ধারায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়নি, বদলে দিয়েছে মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা

ইত্যাদি, যার অভিঘাতে পরিবর্তন ঘটছে রাজনীতির প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান সমূহে। যান্ত্রিক প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সংযোগ-ব্যবস্থাও প্রশাসনিক দক্ষতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলে রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই অভাবনীয় অগ্রগতি (যেমন কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ, ইন্টারনেট-কম্পিউটার যোগাযোগ, আণবিক বোমা ইত্যাদি) শুধুমাত্র জাতীয় রাজনীতিকেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও তার শক্তিসাম্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

রাজনীতিক পরিবর্তনের আর এক প্রত্যক্ষ উপাদানসূত্র হল যুদ্ধ। কোনও কোনও সমাজতত্ত্ববিদ বিশেষত কোঁত, স্পেন্সার, ওপেনহাইমার মানবসমাজের প্রত্যক্ষ রূপান্তরের মূলে এক প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে যুদ্ধের ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে ছোট ছোট গোষ্ঠীসমাজের বিস্তার ঘটেছে; উপজাতীয় জীবন বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে উঠেছে সুবিশাল সাম্রাজ্য। খণ্ড-ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ বিশালতা দান করে এবং তার সাংগঠনিক ভিত্তির দৃঢ়করণের মাধ্যমে যুদ্ধ মানবসমাজের রাজনীতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর সাধন করেছে। আবার 'স্বাধীনতাযুদ্ধ'-এর মাধ্যমেই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং বৃহৎ সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধিত হয়েছে। এককথায়, যুদ্ধ যেমন একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে সমন্বিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে জন্ম দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধারার স্বশাসনের। ফলত, রাজনীতিক ও প্রশাসনিক পন্থা-পদ্ধতির নব নব রূপান্তরের মূলে যুদ্ধের প্রভাব অবিসংবাদী।

আবার, কার্ল ম্যানহাইম প্রজন্মগত বিষমতা বা ব্যবধানকে (Generation gap) রাজনীতিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদানসূত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, আধুনিককালে দ্রুত পরিবর্তনশীল মানবসমাজে সমাজের এক নতুন প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, রুচি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এতটাই বদলে যায় যে নিজেদের প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণে নতুনতর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার দাবী জানাতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিগত শতকের ৬০-এর দশকে ইউরোপে ছাত্র-যুব আন্দোলন অথবা প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব-পরবর্তী নতুন প্রজন্মের গণতন্ত্র ও মুক্ত সমাজের দাবীর কথা উল্লেখ করা যায়। এ প্রসঙ্গে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে সমবেত ছাত্রদের আন্দোলনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালের নারীবাদী আন্দোলন সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা মানবাধিকারের ধারণায় নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। দেশের পূর্বানুসৃত বিধিবিধান-এর ফলে বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতিগত বিচারে রাজনীতিক পরিবর্তনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত বা অনিবার্য পরিবর্তনের ধারা এবং অন্যটি ঈপ্সিত, প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত ধারা। প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজজীবনে যে বিচিত্র গতিশীল প্রক্রিয়া—আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত—দেশের রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর অনিবার্যত নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে, তার প্রভাবে রাজনীতিতে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই কারণে এই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত বা কিছু পরিমাণে মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যায়। এই জাতীয় পরিবর্তনের ফলে রাজনীতিক প্রক্রিয়া-প্রকরণ-প্রতিষ্ঠানাদির যে রূপান্তর সাধিত হয় তাকে কোনোক্রমেই গুণগত পরিবর্তন বলে গণ্য করা চলে না; বড় জোর তা এক মাত্রাগত পরিবর্তন।

বলা বাহুল্য, বিশ্বের প্রায় সকল রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই অল্পবিস্তর এ জাতীয় পরিবর্তন ক্রমাগত সংঘটিত হয়ে চলেছে।

আর দ্বিতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন হল মানুষের ইচ্ছাপ্রসূত ও পরিকল্পিত। কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থায় উপরোক্ত এই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার যে স্থিতিশীল ভারসাম্য বজায় থাকে তা সমাজের সকল অংশের ও স্তরের মানুষের কাছে সমানভাবে গ্রহণীয় বা সহনীয় হয় না। ফলে সেইসব মানুষ তাঁদের সচেতন প্রত্যাশায় প্রস্তাব করেন এবং পরিকল্পনা করেন কিছু বড়রকম পরিবর্তনের। বড়রকম পরিবর্তন মানেই যে তা সবসময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের পক্ষপাতী; তা নয়। কখনও কখনও এই পরিবর্তন-পরিকল্পনা শুধুই পরিমাণগত বা মাত্রাগত, আবার কখনওবা তা রাজনীতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সূচিত করতে পারে। এই কারণে এই দ্বিতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন—যা সচেতনভাবে মানুষের দ্বারা প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত—তা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সংঘটিত হতে পারে। তাই রাজনীতিতে এই প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত পরিবর্তন কখনও যেমন আমূলপন্থী বা বৈপ্লবিক তেমনি কখনও ক্রমিক ও ধীরগতিসম্পন্ন; কখনও পরিবর্তন যেমন আপোষমুখী কখনও তা আবার সংঘাতপূর্ণ; কখনও যেমন রক্তাক্ত তেমনি কখনও রক্তপাতহীন।

৩০.৪.১ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবসমাজের দ্বন্দ্বসংঘাতময় পটভূমি ও তৎসংশ্লিষ্ট আধিপত্য- অধীনতার প্রশ্নগুলির সাথে রাজনীতি ও রাজনীতিক পরিবর্তনের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট সময়কালে সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাত ও আধিপত্য-অধীনতার সমাধানসূত্র হিসেবে যে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা বা পদ্ধতিপ্রকরণ চালু থাকে তা সমাজের সকল অংশের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির পক্ষে স্বভাবতই সমান অনুকূল নয়। ফলে এই অসাম্য ও অসাম্যের বোধ থেকেই সঞ্চারিত হয় ক্ষোভ ও প্রতিবাদের। এই ক্ষোভ ও প্রতিবাদ কখনও কখনও বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের চেহারা নেয়। বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ ও প্রতিবাদ কিছুটা সংগঠিত আকারে বিদ্রোহের চেহারা নিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর মধ্যে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা দূরায়ত লক্ষ্য স্থির থাকে না। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদগুলিকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে এবং তাকে সুচিন্তিত ও দূরায়ত লক্ষ্যে পরিচালিত করেই কার্যকারীভাবে দূরপ্রসারী রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব। তবে এই সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস দুই বিকল্প পথের অনুসারী হতে পারে; একটি অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথ এবং অন্যটি সশস্ত্র ও বৈপ্লবিক পথ। তবে সচরাচর এই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে সংঘটিত রাজনীতিক পরিবর্তনের চরিত্র হয় ধীরগতিসম্পন্ন ও নিতান্তই মাত্রাগত। এর দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনও আমল গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। আবার এ কথা মনে করাও সঙ্গত নয় যে, চরম সংঘাতময় ও সশস্ত্র পরিবর্তনের ধারা মাত্রেই বৈপ্লবিক ও আমূল রূপান্তরের সূচক। যেমন, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ-অর্থনীতিতে কোনও গুণগত আমূল রূপান্তর সচরাচর ঘটে না। বস্তুত সমাজের গুণগত ও দূরপ্রসারী রূপান্তর সাধিত হয় একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির আমূল গুণগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিপ্লবের অবদান ও ভূমিকা ব্যাপক ও চমকপ্রদ, তাই রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিশেষ আলোচনা দাবী করে।

বিপ্লব

রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও চমকপ্রদ এক প্রক্রিয়া হলেও বিপ্লবকে ঘিরে নানা ধারণাগত বিভ্রান্তি ও তাত্ত্বিক বিতর্ক বর্তমান। বিপ্লবের রূপ ও স্বরূপ বিষয়ে যেমন নানা বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত আছে তেমনি, এই প্রসঙ্গে, বিপ্লবের সঙ্গে হিংসার সম্পর্কটিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক দানা বাঁধে। অনেকেই ভেবে থাকেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে-কোনও ষড়যন্ত্রমূলক ও হিংসাত্মক প্রয়াসই হল বিপ্লব। এই অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য যে-কোনও 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' বা কোনও সামরিক অভ্যুত্থানও বিপ্লব পদবাচ্য বা বিপ্লবের সমধর্মী। বলা বাহুল্য, এ ধারণা যথার্থ নয়। বিপ্লবের মধ্যে অতি অবশ্যই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা থাকে, এবং প্রায়শই তার সাথে থাকে গোপন ষড়যন্ত্রমূলক প্রয়াস ও হিংসাত্মক পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিপ্লবের প্রধানতম লক্ষণটি এর মধ্যে অনুপস্থিত। বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে আধিপত্য-অধীনতার শ্রেণীগত বিন্যাস বদলে যায়। পূর্বেকার আধিপত্যকারী শ্রেণীর বদলে নতুন কোনও শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। অন্যদিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ বা রাজনীতিতে শ্রেণীগত ক্ষমতা বণ্টন বিন্যাসের কোনও হেরফের হয় না। ফলত, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিপ্লবের মাধ্যমে সূচিত হয় সামাজিক অগ্রগতির এক গুণগত রূপান্তর। সামগ্রিকভাবে সমাজের এই গুণগত অগ্রগতির প্রভাবে ও প্রয়োজনেই রাজনীতিতেও ঘটে এক আমূল রূপান্তর, প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন শ্রেণীস্বার্থের প্রাধান্য। আর এটাই হল বিপ্লবের মূখ্য চারিত্রলক্ষণ। অতএব যে-কোনও ধরনের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানকে বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না; বরং কখনও কখনও বা প্রতি-বিপ্লব বলে চিহ্নিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের হিংসাত্মক প্রক্রিয়া মাত্রেই বিপ্লব নয়; বিপ্লব হল আর্থ-সামাজিক বিন্যাস-সংস্থাপনের এক গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূচক। আর এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান এবং জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা নিতান্তই নিরুপায় দর্শকের।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবের সাথে হিংসার যথার্থ সম্পর্ক নিয়েও নানা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক বিধিবিন্যাসের এক গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার পরিণতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে প্রয়াস বিপ্লবের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তা কি অনিবার্যভাবেই হিংসাশ্রয়ী ও রক্তপাতপূর্ণ? অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিপ্লব মূলতই ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে পুরোনো সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (মূলত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান)-কে ধ্বংস করে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। আর এই চেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্বেকার আধিপত্যকারী শ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানগুলি সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলে যার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির পক্ষেও হিংসাশ্রয়ী পদ্ধতি অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী ও জরুরি হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপ্লবী শক্তির এই হিংসাশ্রয়ী প্রতিরোধের ধারা ও তার মাত্রা পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিপ্লব-বিরোধী তাত্ত্বিকরা বিপ্লবকে সমাজ পরিবর্তনের এক হিংসাত্মক পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করে এই অভিযোগ করেন যে, এই জাতীয় পরিবর্তনের দরুন সমাজে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, সম্পত্তির বিনাশ ও হত্যালীলা সংঘটিত হয় তার দ্বারা মানুষের কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণই সাধিত হয় বেশি। সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির এই উচ্চমূল্যের কারণেই বিপ্লব সমাজ পরিবর্তনের পন্থা হিসেবে অকাম্য ও পরিত্যাক্ত। অন্যদিকে, বিপ্লবের সমর্থকরা মনে করেন যে, বিপ্লবে হিংসা ও হত্যালীলার দায়ভাগ বিপ্লবীদের উপর বর্তায় না; তা বর্তায় পুরোনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কায়েমিস্বার্থের প্রভুদের উপর, যারা

হিংস্রভাবে সমাজের পরিবর্তন প্রয়াসকে প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। ফলত, কায়েমিস্বার্থের এই হিংসাত্মক প্রতিরোধের উপরই বিপ্লবী হিংসার মাত্রা ও ব্যাপকতা নির্ভরশীল।

রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত থেকে মতাদর্শের ভূমিকা স্পষ্টতই দ্বিমুখী। একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তার স্বপক্ষে বৈধতা সৃষ্টি করতে এবং তাকে স্থায়িত্ব দিতে সক্রিয় থাকে, কোনও কোনও মতাদর্শ তেমনি ঐ ব্যবস্থার বিরোধী। মতাদর্শের কাজ হল প্রচলিত ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসংগতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমূল রূপান্তর বা উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। অর্থাৎ, একদিকে যেমন স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী রাজনীতিক মতাদর্শ আছে, অন্যদিকে তেমনি পরিবর্তমকামী রাজনীতিক মতাদর্শের প্রভাবও বাস্তব রাজনৈতিক কর্মধারার উপর কম হল। এককথায়, রাজনীতিক স্থিতাবস্থা বা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তেমনি মতাদর্শের ভূমিকা সমান উল্লেখনীয়।

রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই স্মরণে রাখা দরকার যে, রাজনীতিক পরিবর্তনের ধারাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ধারা যা মানুষের সচেতন ইচ্ছাপ্রসূত বা পরিকল্পিত নয়। সমাজের গতিশীল জীবনধারার নানা অভিঘাতে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থায় বাধ্যত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এর সাথে রাজনীতিক মতাদর্শের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু মানুষের সচেতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয় বা সাধনের প্রয়াস চলে তা সাধারণত কোনও-না-কোনও মতাদর্শের সাথে সম্পর্কিত। রাজনীতিক মতাদর্শই কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত অসংগতি অযৌক্তিকতা ও অমানবিকতা, এমনকি সমগ্র সমাজব্যবস্থাটির অনুপযোগিতা বা অপ্রাসঙ্গিকতাকে উন্মোচিত করার মাধ্যমে তার ক্রমিক সংখ্যার অথবা সামগ্রিক বিলোপ ও রূপান্তর দাবী করতে পারে। রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত থেকে তাই মতাদর্শকে স্পষ্টতই দু'ভাগে ভাগ করা যায়—ক্রমিক, সংস্কারধর্মী পরিবর্তনের সমর্থক মতাদর্শ এবং আমূল বৈপ্লবিক রূপান্তরের পক্ষপাতী মতাদর্শ। তবে, আপাতভাবে এ জাতীয় ভাগ সঠিক মনে হলেও গভীরতর বিশ্লেষণে মতাদর্শের এরকম বিভাজন হয়তো খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রচলিত সমাজ-রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিত থেকেই মতাদর্শের এই সংস্কারবাদী ও বৈপ্লবিক চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। যেমন, উদারনীতিবাদ যেহেতু বিদ্যমান কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক তাই উদারনীতিবাদ এই ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের বিরোধিতা করে না। অন্যদিকে, মার্ক্সবাদ যেহেতু শ্রেণীশোষণভিত্তিক বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিপক্ষে তাই তার রূপান্তর সাধনে বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষপাতী হলেও প্রতিষ্ঠিত কোনও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষপাতী নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে যে মতাদর্শ তা সর্বদাই সংস্কারপন্থী, বৈপ্লবিক নয়।

(১) মানুষের গতিশীল জীবনধারায় সামাজিক পরিবর্তনের মতো রাজনীতিক পরিবর্তনও এক অনিবার্য ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এ দু'টি ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়া। সামগ্রিকভাবে সমাজে মানুষের জীবনধারায় যত প্রকার পরিবর্তন ঘটে তা সবই সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে অভিহিত হতে পারে। এই অর্থে রাজনীতিক পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের অঙ্গ। কিন্তু সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন রাজনীতিক পরিবর্তন নয়, বলাই বাহুল্য।

(২) রাজনীতিক পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিতে। প্রত্যেক সমাজেই আধিপত্য-অধীনতার এক কাঠামোগত বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমাজের বহুবিচিত্র দ্বন্দ্বসংঘাতের চাপে আধিপত্য-অধীনতার এই কাঠামোগত বিন্যাস ও তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরীতিতে যে বদল ঘটে তাকেই রাজনীতিক পরিবর্তন বলে অভিহিত করা চলে। মানুষের সামাজিক জীবনধারায় যে আর্থিক, প্রযুক্তিগত, বা শিক্ষা-সংস্কৃতিগত নানা পরিবর্তন ঘটে চলে তার প্রভাবে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থাতেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তবে সমাজের জীবনধারাগত পরিবর্তনের সমানুপাতিক হারে বা গতিবেগে যে রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটে তা বলা যায় না।

(৩) রাজনীতিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে চারটি উপাদানসূত্রের উল্লেখ করেছেন রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের পণ্ডিতরা। গুরুত্বের বিচারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অর্থনীতিতে শ্রেণী-সংঘাতগত উপাদান। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় উৎপাদন ধারায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রসারগত উপাদান যা শুধু সামাজিক উৎপাদন ও বিনিময় ধারাতেই নয়, সমাজের মানবিক সম্পর্ক, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ইত্যাদিকেও প্রভাবিত করে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য উপাদান হল যুদ্ধ, যার মাধ্যমে প্রচলিত রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তিত হয়। সবশেষে উল্লেখ করতে হয় প্রজন্মগত ব্যবধানের উপাদানটির কথা। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, রুচি ও প্রত্যাশায় যে পরিবর্তন ঘটে তার চাপেও রাজনীতিক কাঠামো ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ বদলাতে পারে।

(৪) রাজনীতিক পরিবর্তন বিভিন্ন ধারায় সংঘটিত হয়। প্রধান দু'টি ধারার একটি হল স্বতঃস্ফূর্ত, অনিবার্য বা অপরিকল্পিত ধারা এবং অন্যটি প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত ধারা। আবার এই পরিকল্পিত ধারার পরিবর্তনকেও দু'টি ধারায় ভাগ করা যায়—একটি নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আইনানুগ ধারা এবং অন্যটি চরমপন্থী বৈপ্লবিক ধারা। প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থার বিপক্ষে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ বিক্ষিপ্ত বা অসংলগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পথে তাকে কাজে লাগিয়ে সংগঠিত হয় বিপ্লব।

(৫) রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূল্যবান আলোচনা করেছেন। রাজনীতির স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য পরিবর্তনের যে বিরামহীন ধারা তার সাথে মতাদর্শের তেমন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কিন্তু রাজনীতিক বিধিব্যবস্থায় মানুষের সচেতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যে পরিবর্তন সংগঠিত হয় তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোনও-না-কোনও মতাদর্শের অনুসারী। এক্ষেত্রে মতাদর্শের ভূমিকা দ্বিবিধ। মতাদর্শ একদিকে যেমন প্রচলিত কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে তার স্থিতিশীলতা

বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি আবার অন্যদিকে বিপরীতধর্মী কোনও মতাদর্শ ঐ ব্যবস্থার অপ্রসাঙ্গিকতা ও অযথার্থতাকে উন্মোচিত করে তার পরিবর্তন বা বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়।

নিম্নোক্ত বিবৃতিগুলি ঠিক না ভুল তা (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
১। সামাজিক পরিবর্তন মাত্রেই রাজনৈতিক পরিবর্তন—	☐	☐
২। রাজনীতিক পরিবর্তন মাত্রেই সামাজিক পরিবর্তন—	☐	☐
৩। আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুন রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয়—	☐	☐
৪। সমাজের উৎপাদনধারা ও জীবনধারায় প্রযুক্তিগত বিকাশ-বিস্তারের দরুন রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয়—	☐	☐
৫। রাজনীতিক পরিবর্তনের ধারা সর্বদাই পরিকল্পিত—	☐	☐
৬। রাজনীতিক পরিবর্তনের এক স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক প্রক্রিয়া হল বিপ্লব—	☐	☐
৭। রাজনীতিক মতাদর্শ ছাড়া কোনো রাজনীতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়—	☐	☐

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। রাজনীতিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

২। সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক পরিবর্তনের পার্থক্য কী?

৩। রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসভূমি কী?

৪। রাজনীতিক পরিবর্তনের অর্থনৈতিক উপাদান বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। যুদ্ধ কীভাবে রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন করে আলোচনা করুন।

৬। বিপ্লবের সঙ্গে সামরিক অভ্যুত্থানের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৭। মতাদর্শের সাথে রাজনীতির স্থিতাবস্থা ও রাজনীতিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

১। G. A. Almond & G. B. Powell : Comparative Politics

২। T. Bottomore : Political Sociology

৩। Samuel Huntington : Political Order in a Changing Society

৪। Ali Ashraf & L. N. Sharma : Political Sociology

□

৩১.০ উদ্দেশ্য

৩১.১ প্রস্তাবনা

৩১.২ ধ্যানধারণা তত্ত্ব ও মতাদর্শ

৩১.৩ মতাদর্শ বিভিন্নতা

৩১.৩.১ মতাদর্শের আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির ভিন্নতা

৩১.৪ মতাদর্শের উপযোগিতাগত কার্যাবলী

৩১.৪.১ মতাদর্শ ও সামাজিক ক্ষমতা বণ্টন

৩১.৪.২ মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

৩১.৫ মতাদর্শের অবসান

৩১.৬ সারাংশ

৩১.৭ অনুশীলনী

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক মতাদর্শ বলতে কী বোঝায়?
- রাজনীতিক ধারণা, তত্ত্ব ইত্যাদির সাথে মতাদর্শের পার্থক্য কী?
- মতাদর্শের ভিন্নতার কারণ কী?
- মতাদর্শের কার্যকরী উপযোগিতা কী কী?
- রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা।
- মতাদর্শের অবসান বলতে কী বোঝায়?

আধুনিক রাজনীতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিতব্য বিষয় হল রাজনীতিক মতাদর্শ, এবং বিবিধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এর সম্পর্ক। যে-কোনও জনসমাজের রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

ও প্রক্রিয়াসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় একটি বিশেষ রাজনীতিক মতাদর্শের প্রেক্ষিত খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এর কারণ ইঙ্গিত করতে গিয়ে Alan R. Ball বলেছেন যে, প্রতিটি রাজনীতিক ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ এক মূল্যবোধ-কাঠামোর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। (....in every type of political system, policies are formulated and decisions are made within a value-frame-work.) তুলনামূলক রাজনীতির পরিসরে তাই ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক মতাদর্শের প্রসঙ্গ ও পটভূমি অনিবার্যত এসে পড়ে। তাই বলা চলে, কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তার অন্তর্গত প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা-বিশ্লেষণে রাজনীতিক মতাদর্শ এক অপরিহার্য সহায়ক উপাদান।

কিন্তু মূল প্রশ্নটি হল, মতাদর্শ, বা বিশেষভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতে ঠিক কী বোঝায়? মতাদর্শ বা এর ইংরিজী প্রতিশব্দ Ideology কথাটি বর্তমানে নানা অনির্দিষ্ট অর্থে প্রচলিত হলেও এই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেন ফরাসী চিন্তাবিদ Destutt de Tracy ১৭৯৭ সালে। মূলত অধিবিদ্যামূলক ভাবধারার বিরোধীরূপে তিনি 'ভাবধারার বিজ্ঞান' রূপে মতাদর্শ শব্দটি ব্যবহার করেন। অতীতের অবৈজ্ঞানিক অধিবিদ্যামূলক চিন্তাধারার বিপক্ষে ফরাসী বিপ্লবকালীন যুক্তিভিত্তিক সংহত ভাবধারাকে বোঝাতেই তিনি নতুন শব্দটির উদ্ভাবন করেন।

রাজনৈতিক ধারণাসমূহ (Political ideas), রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতবাদ (Political theory) ও রাজনৈতিক মতাদর্শ (Political ideology)—এগুলি আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও প্রকৃত বিচারে সুনির্দিষ্ট অর্থে এদের মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য বর্তমান। রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বলতে সাধারণত বিশেষ বিশেষ বা খণ্ড খণ্ড সামাজিক বিষয় বা প্রশ্ন সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামতকে বোঝায়। এর মধ্যে কোনও সুসংবদ্ধ সামগ্রিক তত্ত্বের হদিশ থাকে না। যেমন, সার্বভৌমত্বের ধারণা, সাম্যের ধারণা বা স্বাধীনতার ধারণা ইত্যাদি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড ধারণাকে ঘিরে সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা গড়ে উঠতে পারে এবং তখন আমরা তাকে তত্ত্ব বা মতবাদ নামে অভিহিত করতে পারি। যেমন, সার্বভৌমত্বকে ঘিরে একত্ববাদী বা বহুত্ববাদী তত্ত্ব; সাম্য সম্পর্কে উদারনীতিক তত্ত্ব বা সমাজবাদী তত্ত্ব; কিংবা স্বাধীনতা বিষয়ে উদারনীতিবাদী বা মার্ক্সীয় তত্ত্ব।

তবে তত্ত্ব বা মতবাদের সঙ্গে মতাদর্শের (Ideology) পার্থক্য সাধারণভাবে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু অন্তত দু'টি পার্থক্যের কথা এখানে বিশেষ উল্লেখনীয়। প্রথমত, তত্ত্ব বা মতবাদের সাথে তুলনায় মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীগত ব্যাপকতা অনেক বেশি। মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেক বেশি সামগ্রিকতা লক্ষ্যণীয়। তুলনায় তত্ত্ব বা মতবাদের দৃষ্টিকোণ অনেক সীমিত ও খণ্ডিত। দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব বা মতবাদের মধ্যে ততখানি কর্মসূচীর দায়বদ্ধতা থাকে না যতখানি থাকে মতাদর্শের ক্ষেত্রে। মতাদর্শ বলতে এমন এক ভাবাদর্শের ব্যবস্থাকে বোঝায় যা আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে করণীয়ের ইঙ্গিত দেয়। C. J. Friedrich এবং J. K. Brzeziuski রাজনৈতিক মতাদর্শকে "action-related system of ideas" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এঁদের মতে, রাজনৈতিক মতাদর্শ মাত্রেই কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ বা পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত।

প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক মতাদর্শের এই কর্মসূচী-দায়বদ্ধ চরিত্রটিই কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চোখে অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন, Preston King মনে করেন, Ideology "may or may not possess a logical or philosophical character at all; but it must possess a political character, i.e. a content without which it cannot be described an ideology—a guide to direct political action". এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দেন এবং বলেন যে, রাজনৈতিক দর্শন চিন্তা ও উপলব্ধিকে অনুপ্রাণিত করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঝোঁক, কার্য ও দায়বদ্ধতার প্রতি। ("Political philosophy evoks reflection & understanding, while ideology is more likely to imply commitment & action".)

সংক্ষেপে তাই মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাধারা যার সাথে বিশ্লেষণ, যুক্তি পরম্পরা, যথার্থতা, বৈধতা এবং বিশ্বাসও জড়িত। আর রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাগুচ্ছ যা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৌদ্ধিকভাবে সমর্থন করে ও গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রকৃতি বিচারে রাজনৈতিক মতাদর্শকে নানাদিক থেকে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, কোনও কোনও মতাদর্শের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস অপেক্ষাকৃত শিথিল ও অসংবদ্ধ, যদিও তার আবেদনে আবেগ ও উন্মাদনা প্রবল। আবার কোনও কোনও মতাদর্শের সংহতি, বৌদ্ধিক পারম্পর্য ও বিন্যাস অনেক বেশি ঘনসন্নিবদ্ধ ও সুগ্রথিত। ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের মতো মতাদর্শে যতখানি আবেগ ও উন্মাদনার তীব্রতা ততখানি যুক্তির পারম্পর্য ও সংহতি নেই। অন্যদিকে, উদারনীতিবাদ অথবা মার্ক্সবাদে যুক্তির সংগতিপূর্ণ বিন্যাস তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীগত চরিত্রের বিচারে মতাদর্শকে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী—প্রধানত এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। অসাম্য ও বৈষম্যমূলক সমাজ-রাজনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার পক্ষে যেসব মতাদর্শ তাকে দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ বলা যায়। অপরপক্ষে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিপক্ষে যেসব মতাদর্শ তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলে ও ঐসব অসাম্য-বৈষম্যের অপসারণে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তাকে বামপন্থী মতাদর্শ বলে।

অনেকে আবার দৃষ্টিভঙ্গীগত বা উদ্দেশ্যগত দিক থেকে মতাদর্শকে রক্ষণশীল ও বৈপ্লবিক—এই দুই ভাগে ভাগে করার পক্ষপাতী। যেসব মতাদর্শ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অথবা স্থানকালের সাথে সাযুজ্য বজায় রাখতে ক্রমিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমান্বয় রূপান্তরে বিশ্বাসী তাদের রক্ষণশীল বা স্থিতাবস্থাকামী মতাদর্শ হিসেবে গণ্য করা যায়। অন্যদিকে সমাজের বৈপ্লবিক ও প্রয়োজনে সহিংস বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমূল অগ্রগামী রূপান্তরে বিশ্বাসী যেসব মতাদর্শ তাদের বৈপ্লবিক মতাদর্শ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে একটি বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থাগামী মতাদর্শের চাইতে বৈপ্লবিক মতাদর্শ আপাতভাবে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩১.৩.১ মতাদর্শের আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির ভিন্নতা

যে-কোনও মতাদর্শের উৎসভূমির সন্ধানে গিয়ে অনিবার্যভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে কোনও-না-কোনও আর্থ-সামাজিক পটভূমি। আর এই আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমিকে বাদ দিয়ে কোনও মতাদর্শকে যথাযথভাবে বোঝা যায় না। সমাজের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যে স্ববিরোধ বা সংঘাত মূর্ত হতে থাকে তার প্রকৃতি বিচার করে তা থেকে উত্তরণের পথ নির্ধারণ করার চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে কোনও-না-কোনও মতাদর্শ। ফলত, সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক পটভূমির চরিত্র এবং তার অভ্যন্তরে স্ববিরোধ-সংঘাতগুলির প্রকৃতিই নিরূপণ করে নির্দিষ্ট মতাদর্শের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে যে বাণিজ্যিক পুঁজির ও বণিক পুঁজিপতিদের উদ্ভব ঘটছিল এবং এসবের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী দমনপীড়নের নাগপাশের বিরুদ্ধে আমজনতার যে বিক্ষোভ তারই পটভূমিতে উদারনীতিবাদী মতাদর্শের জন্ম হয়েছিল। অনুরূপভাবে ইতিহাসের ভিন্ন এক পর্যায়ের উত্তরণ পর্বে জন্ম নিয়েছিল মার্ক্সবাদী বা সাম্যবাদী মতাদর্শ যা বিকশিত পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পটভূমির অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা স্ববিরোধ ও সংঘাতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের পথনির্দেশ করতে চেয়েছে। আবার বিপরীত দিক থেকে, নাৎসীবাদ বা ফ্যাসীবাদী মতাদর্শের চরিত্রকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে যে নির্দিষ্ট ইতিহাসগত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে এদের জন্ম এবং সেই পটভূমিতে পরিব্যাপ্ত যে সংকট ও সংঘাত তার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করাটা জরুরি।

কার্ল ফ্রিডরিশ, ডি. কে. ব্রেজিনস্কি, রবার্ট ডাল, অ্যালান বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনীতিক মতাদর্শের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা নিরূপণে তার দায়বদ্ধ কর্মমুখী চরিত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজনৈতিক কর্মধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত চিন্তাবিন্যাসই যে রাজনৈতিক মতাদর্শ এ কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মহলে প্রায় সর্ববাদীস¥ত ধারণা। বস্তুত, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রধান ভূমিকাই হল কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা। অবশ্য এই প্রধান ও প্রাথমিক ভূমিকার পাশাপাশি মতাদর্শের আনুষঙ্গিক আরও কিছু উপযোগিতামূলক অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের এক ধারা রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের সাথে সমাজে ক্ষমতা বণ্টনের ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসে যেমন মতাদর্শের সমর্থন থাকে তেমনি সমাজে ক্ষমতা বণ্টনের ধারাকে বৈধতা দান করাও মতাদর্শের অন্যতম কার্যকরী ভূমিকা হিসেবে গণ্য হয়। উদারনীতিবাদী মতাদর্শ গণসার্বভৌমত্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সার্বজনীন ভোটাধিকার, জনমত গঠনে গণমাধ্যমগুলির স্বাধীন ভূমিকা, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের সক্রিয় কর্মপ্রয়াস ইত্যাদিকে বৈধতা দেয়। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক পথে অবাধ প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি থাকে—আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমূহের আইনগত সমমর্যাদা, রাজনীতিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এবং নানাপ্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি ও বৈধতা দান

উদারনীতিবাদের অবদান। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, পূর্বেকার প্রাধান্যকারী শ্রেণীসমূহের অবদমন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্যবাদী দলের একক প্রাধান্যকারী ভূমিকা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের দ্বারা স্বীকৃত। এককথায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার সপক্ষে তাত্ত্বিক সমর্থন গড়ে তোলে এবং তার বৈধতা সৃষ্টির মাধ্যমে তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে।

মতাদর্শের এই সর্বপ্রধান কার্যকরী ভূমিকাটির পাশাপাশি তার অন্যান্য উপযোগিতামূলক অবদানও উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠীর দাবীদাওয়ার নায্যতা, ও বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে মতাদর্শের সাহায্য গ্রহণ করে। বস্তুত মতাদর্শের প্রেক্ষিত ব্যতীত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দাবীদাওয়া নিজ নিজ যথার্থ ও বৈধতা প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায়, সমাজে নানান দাবীদাওয়া সংকলিত ও উপস্থাপিত হয় প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের নিরিখে।

এ ছাড়াও কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের যথাযোগ্যতা ও বিচার করা হয় সংশ্লিষ্ট মতাদর্শের মাপকাঠিতে। শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিচার করার ক্ষেত্রেও মতাদর্শের প্রেক্ষিত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, উদারনীতিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মান্ধতাপ্রসূত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের এবং মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের যথার্থতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

উপরন্তু আর একটি ব্যাপারেও রাজনৈতিক মতাদর্শ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক 'এলিট' সম্প্রদায় নির্দিষ্ট মতাদর্শের দোহাই দিয়ে তাঁদের উচ্চাশা চরিতার্থ করতে ঘোষিত লক্ষ্যের সপক্ষে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সমবেত করতে সক্ষম হন। নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রেক্ষিত থেকেই তাঁরা কখনও 'গণতন্ত্রের স্বার্থে' কখনও 'সমাজতন্ত্রের স্বার্থে' আবার কখনও 'জাতীয় গরিমার স্বার্থে' জনগণের মধ্যে আবেগময় উদ্দীপনা সঞ্চার করে তাঁদের উচ্চাভিলাষী অভিযান, এমনকি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাও করেন, এবং সেই অভিযান বা যুদ্ধের সপক্ষে দেশের ব্যাপক জনসমষ্টিকে সমবেত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পশ্চিমী দুনিয়ায়, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে একজোট করতে 'গণতন্ত্র রক্ষা'র দোহাই দেওয়া হয়েছে। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীকে এবং তার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে 'সমাজতন্ত্র রক্ষা'র দোহাই দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে 'সলিডারিটি' আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযান এবং চীনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের ঘটনা এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আবার ইউরোপে বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শক্তি 'জাতীয় গরিমা' রক্ষার দোহাই দিয়ে নিজেদের শক্তিকে সংহত করেছে এবং আগামী অভিযান পরিচালনা করেছে। এমনকি সাম্প্রতিককালেও প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় রাখছে বর্ণবিদ্বেষী কিছু দক্ষিণপন্থী উগ্রবাদীরা।

মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

বিদ্যমান কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করতে এবং তাকে স্থায়িত্ব দিতে যেমন সংশ্লিষ্ট মতাদর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি ঐ ব্যবস্থার পটভূমিতে কোনও বিপরীত মতাদর্শের

কাজ হল বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসংগতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমূল রূপান্তর বা উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

বস্তুত, রাজনীতিক পরিবর্তন একটি সার্বজনীন ঘটনা বা বিষয়, যদিও এই পরিবর্তনের ধারা বা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় না যেহেতু সময় ও পরিস্থিতি সর্বদা গতিশীল। কিন্তু পরিবর্তন প্রক্রিয়া কখনও যেমন বৈপ্লবিক তেমনি কখনও ক্রমিক ও ধীরগতিসম্পন্ন, কখনও পরিবর্তন যেমন আপোষধর্মী কখনওবা তা সংঘাতপূর্ণ; কখনও যেমন রক্তক্ষয়ী তেমনি কখনও রক্তপাতহীন। তবে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, কোনও বিদ্যমান ব্যবস্থার সপক্ষে যে মতাদর্শ সে মতাদর্শ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও সেই পরিবর্তনকে ক্রমিক আপোষমুখী ও শান্তিপূর্ণ হবার দাবী জানায়। অন্যদিকে, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে স্পষ্টত অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিরোধিতামূলক সম্পর্কে স্থিত মতাদর্শ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে কিছুটা সংঘাতময় ও আপোষহীন ধারার অনুসারী করতে সচেষ্ট হতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনৈতিক পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত দু'ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন স্থিতাবস্থা-রক্ষাকারী রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে, ঠিক তেমনি পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবও বাস্তব রাজনৈতিক কর্মধারার উপর কম নয়। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী মতাদর্শ যেমন একদিকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে চায় তেমনি অন্যদিকে এতদ্দ্বারা বিরোধী শক্তিকে দুর্বল ও নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করে। আবার পরিবর্তনকামী বা বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করে তেমনি আবার পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবিত করে সামাজিক রূপান্তর সাধনে এক কার্যকর শক্তি হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, রাজনীতিক ব্যবস্থার সাথে নির্দিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের সংযোগ-সংগতি নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য কোনও ব্যাপার নয়। সচরাচর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহের প্রেক্ষাপট জুড়ে কোনও-না-কোনও মতাদর্শগত কাঠামো বা একাধিক মতাদর্শের সমন্বয়ে ধারার হদিশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু রাজনীতিক ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধের সুসংহত বিন্যাসের ভিত্তিতে সচেতনভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

অথচ এরই পাশাপাশি অতি সাম্প্রতিক কালে—অর্থাৎ, বিগত প্রায় তিন-চার দশকে 'মতাদর্শের অবসান' (End of Ideology) সংক্রান্ত ধারণাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ্‌দের মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ড্যানিয়েল বেল (The End of Ideology), জন কেনেথ গলব্রেথ (The New Industrial State) প্রমুখ চিন্তাবিদরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শিল্প-সভ্যতার দ্রুত প্রসার ও আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তারের দাবীতে মতাদর্শগত কঠোরতার ভিত্তি বহুলাংশে শিথিল হয়ে এসেছে। এঁদের মতে, আধুনিক কালের শিল্পোন্নত বহুত্ববাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার (Plural Society) কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি একরোখা মনোভাব

বা একমুখী দায়বদ্ধতা অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মনোভাবেও এই মতাদর্শগত আনুগত্যের প্রশ্নে অনেক শিথিলতা ও বিপরীত মতাদর্শ সম্পর্কে সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত ব্যবধান প্রকৃত বিচারে অত্যন্ত স্বল্প। অনুরূপভাবে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে রক্ষণশীল দল ও সমাজ গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যেকার পুরোনো মতাদর্শগত ব্যবধান আজ আর ততখানি দুস্তর ও অনতিক্রম্য নয়। অন্যদিকে, অধুনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে পুরোনো সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের কঠোরতা বিপুল মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক বাজার-অর্থনীতির সাথে আপোষের মাধ্যমে 'বাজার সমাজতন্ত্র' (Market Socialism) নামক ধারণার জন্ম হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের নানা প্রান্তে 'উদারীকরণ', 'বেসরকারিকরণ', 'বিশ্বায়ন' ইত্যাদির প্রবল অভিঘাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার মতাদর্শগত ভিত্তি ক্রমশ শিথিল হচ্ছে।

বিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি ফ্রেডারিখ ওয়াটকিনস্ তাঁর "The Age of Ideology" গ্রন্থে মতাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে মতাদর্শের মধ্যে একটা রাজনৈতিক একরোখামি বর্তমান। আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "মতাদর্শগত উগ্রতার প্রতি ক্রমক্ষীয়মাণ সমর্থন এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বোঝাপড়ার মনোভাবের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ একালের প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।" একালের প্রেক্ষিতে এই অভিমতের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমকালীন বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যদিও এই মতের সমর্থক নন তবু 'মতবাদের অবসান' ধারণাটি ক্রমশ অধিক স্বীকৃতি লাভ করছে।

মতাদর্শহীনতার কথা নতুন করে উঠেছে দীর্ঘ পাঁচ দশকের ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে। সমাজতন্ত্র বনাম ধনতন্ত্রের মতাদর্শগত লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রের একতরফা পিছিয়ে আসা ও ক্রম-অবলোপের পর রাজনীতি, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় উভয়ক্ষেত্রেই বাস্তবতাবোধে পরিচালিত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু নিছক বাস্তবতাবোধও একরকমের মতাদর্শই। সুতরাং, মতাদর্শহীনতা কথাটি ভ্রান্তিজনক। বরং বলা যায়, একটি প্রবল মতাদর্শের অবলোপের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেটি ভরাট হতে বেশকিছু সময় লাগে।

ব্যবহারিক রাজনীতির সাথে রাজনীতিক মতাদর্শের সম্পর্ক আধুনিক রাজনীতি শাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু রাজনীতিক মতাদর্শ বিষয়ে সাধারণত কিছু ধারণাগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ধারণা, রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে রাজনীতিক মতাদর্শকে অনেকে সমার্থক বিবেচনা করেন। প্রকৃত বিচারে রাজনীতিক মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাগুচ্ছ যার সাথে বিশ্লেষণ, যুক্তি-পারম্পর্য, যথার্থতা, বৈধতা এবং বিশ্বাস সমন্বিত।

মতাদর্শের মূল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল এর কর্মমুখী দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ, কোনও একটি রাজনীতিক মতাদর্শ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৌদ্ধিকভাবে সমর্থন করে তাকে গড়ে উঠতে ও টিকে থাকতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, প্রচলিত কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসংগতি

ও সীমাবদ্ধতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে মতাদর্শ ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা বিনাশে সচেষ্ট হয়। উপরন্তু সমাজে ক্ষমতার কাঠামোগত বিন্যাসের পটভূমিতে মতাদর্শের ভূমিকা সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রাগ্রসর শিল্প-সভ্যতার পটভূমিতে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের অভূতপূর্ব প্রসারের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ 'মতবাদের অবসান' নামক ধারণাটি গড়ে তুলেছেন। ধারণাটি অবশ্যই বিতর্কমূলক।

১। উদাহরণসহ রাজনৈতিক মতাদর্শের সংজ্ঞা দিন।

২। রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য কী?

৩। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৪। আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির উপর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকৃতি কতখানি নির্ভরশীল?

৫। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৬। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

৭। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে মতাদর্শের ভূমিকা কী?

৮। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মতাদর্শের ভূমিকা কী?

৯। 'মতাদর্শের অবসান' বলতে কী বোঝায়?

১০। 'মতাদর্শের অবসান' ধারণাটি কতদূর গ্রহণযোগ্য?

১। Alan R. Ball : Modern Politics & Government

২। Finer S. E. : Comparative Government

৩। Carl J. Friedrich & J. K. Brezinski : Totalitarian Dictatorship & Autocracy

৪। Preston King & B. Parekh : Politics & Experience

৫। D. Bell : The End of Ideology

৬। Johari J. C. : Comparative Politics

৭। নির্মলকান্তি ঘোষ : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

□

৩২.০ উদ্দেশ্য

৩২.১ প্রস্তাবনা

৩২.২ রাজনীতিতে সামরিক প্রভাব বৃদ্ধির অনুকূলতা

৩২.৩ সামরিক বাহিনীর বিশিষ্টতা

৩২.৪ সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও তার নির্ধারক

৩১.৫ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার বিভিন্ন রূপ

৩২.৫.১ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন ও সীমিত হস্তক্ষেপ

৩২.৫.২ সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ

৩২.৫.৩ পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসন

৩২.৬ সারাংশ

৩২.৭ অনুশীলনী

৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার সাথে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক।
- রাজনৈতিক বাহিনীর স্বাতন্ত্র্যসূচক বিশিষ্টতা।
- রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার নির্ধারক উপাদান।
- সামরিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের বিভিন্ন রূপ।

সাধারণভাবে রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী দু'টি আপাত বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে গণ্য হয়।

প্রতিটি সুসংগঠিত মানবসমাজে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের একটা কাঠামোগত বিন্যাস থাকে। এই কাঠামোগত বিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহের অনুশীলনকেই সংক্ষেপে আমরা রাজনীতি নামে চিহ্নিত করি। রাজনীতির এই অনুশীলনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না।

ক্ষমতা বা কর্তৃত্বে এই কাঠামোগত বিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহের প্রতি জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে এক স্বাভাবিক অনুমোদন বা স্বীকৃতি গড়ে ওঠে যা ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে। কিন্তু কখনও কখনও এই রাজনৈতিক বৈধতার ক্ষেত্রেও সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ফলে ক্ষমতার কাঠামোগত বিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিকে টিকিয়ে রাখতে তখন প্রয়োজন হয় বল প্রয়োগের এক অতি সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত বাহিনী যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পক্ষে এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান।

আধুনিক রাষ্ট্রে, বিশেষত একালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের ধারণায় রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক সচরাচর তেমন স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নয়। বরং, একালের লৌকিক ধারণায় সামরিক বাহিনীর এক রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বর্তমান। তুলনায়, এ দুইয়ের মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন ও কিছু স্পষ্ট সম্পর্ক সেইসব দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা ও চেতনায় ধরা পড়ে যেখানে হয় সরাসরি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে অথবা যেখানে অসামরিক শাসকগোষ্ঠী তাঁদের স্বৈরাচারী আধিপত্য বজায় রাখতে প্রায়শই সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে থাকেন।

বস্তুত, সাবেকি ধারণা অনুসারে সামরিক বাহিনী হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এমন এক স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সংগঠন যা অসামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে দেশের ভূখণ্ডগত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সম্পাদন করে এবং বিশেষ প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করে।

কিন্তু এই সাবেকি ও প্রচলিত ধারণা আধুনিক কালের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। বর্তমানে বহু দেশেই অসামরিক সরকারের অস্তিত্ব ঐসব দেশের সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিগত অর্ধ শতাব্দিকালে বিশ্বের নানা দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং স্পেন ও জাপানে এরকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এজাতীয় ঘটনা ঘটতে লাগলো তৃতীয় দুনিয়ার নানা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশে অসামরিক সরকার, সামরিক বাহিনীর দ্বারা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছে, অথবা এক অসামরিক সরকারের বদলে অন্য এক অসামরিক সরকার ক্ষমতাশীন হয়েছে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে। এ প্রসঙ্গে Alan R. Ball-এর মন্তব্যটি : "The lengthy list of successful or unsuccessful direct intervention by the military....since 1945 creates the impression that seizure of political control by the armed forces, or the military ensuring the replacement of one civilian government by another, is the norm rather than the exception in modern political systems."

Fred R Vonder Mehden তাঁর The Politics of Developing Nations গ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ৭৫টি দেশের মধ্যে প্রায়

২৫টিতেই সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। Joseph La Palambara তাঁর Politics within Nations গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের প্রায় ৭১ শতাংশ সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত। অনুরূপভাবে এশিয়া মহাদেশের ৪২ শতাংশ এবং লাতিন আমেরিকার ৫২ শতাংশ আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত।

অধ্যাপক S. E. Finer তাঁর Comparative Politics গ্রন্থে এবং Jean Blondel তাঁর Comparative government গ্রন্থে এ বিষয়ে সপ্রসঙ্গ বিশদ আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক Finer-এর মতে, তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল ও অনগ্রসর দেশগুলিতেই সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য, পশ্চিমের অগ্রসর দেশগুলির রাজনীতিক প্রক্রিয়া যে সামরিক বাহিনীর প্রভাব থেকে মুক্ত এমন নয়। Finer এ প্রসঙ্গে যুদ্ধপূর্ব জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, স্পেন ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নানা দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত Finer-এর স্পষ্ট মত হল, রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি তৃতীয় দুনিয়াতেই শুধু নয়, বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশের প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থায় এক স্বাভাবিক প্রবণতা। তবে পার্থক্য এই যে, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যতটা প্রত্যক্ষ ও প্রকট অন্যত্র তুলনায় তা অনেকখানি প্রচ্ছন্ন।

(Autonomous Characteristics)

যে-কোনও আধুনিক রাজনৈতিক সমাজে বহুবিধ প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বজায় রাখতে ও বৃদ্ধি করতে নিজেদের সাংগঠনিক রূপ দেয়। এইভাবেই নানা চাপসৃষ্টিকারী ও স্বার্থগোষ্ঠী আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরে জন্ম নেয় ও ধীরে ধীরে বৈধতা অর্জন করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা ও প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে এইসব সুসংগঠিত গোষ্ঠীগুলি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইরকমই এক সুসংগঠিত ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির সাথে সামরিক বাহিনীর লক্ষ্যণীয় পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাধারণভাবে যেসব চাপসৃষ্টিকারী বা স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সক্রিয় থাকে তাদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনও প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক ভূমিকা নেই; তারা সংগঠিত হয় নিজস্ব উদ্যোগে। পক্ষান্তরে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রয়োজনে এক অতি অপরিহার্য ও প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে।

সামরিক বাহিনীর এই বিশেষত্বটি ছাড়াও এর প্রকৃতি ও সংগঠনগত বিশেষত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই এটা অনুধাবন করা সহজ হবে কেন আধুনিক রাষ্ট্রে অন্য যে-কোনও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর তুলনায় সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা, এমনকি তাকে কুক্ষিগত করার ব্যাপারে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

লক্ষ্যণীয় হল, বর্তমানের সবরকম রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই সামরিক বাহিনী অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চারিত্রলক্ষণগুলি Finer, Lucian Pye ও Alan Ball প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে।

(১) সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত এবং কেন্দ্রবদ্ধ (hierarchical & centralized)। এখানে প্রতিটি সদস্যের অবস্থান সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরের সৈনিক ও কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ নিঃশর্তে মেনে চলতে অধস্তন কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকে। সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকে তাই সামরিক বাহিনীর সাথে আমলাতন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ এবং তা পালনের ক্ষেত্রে অধস্তনের বাধ্যতা সামরিক বাহিনীর মতো এত কাঠোরভাবে আমলাতন্ত্রে অনুসৃত হয় না।

প্রকৃত বিচারে সামরিক বাহিনীর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রীতিমতো চরম ও দৃষ্টান্তমূলক। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও বিনা বাক্যব্যয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ পালন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর বিধিব্যবস্থা হল অত্যন্ত কঠোর ও আপসহীন। কঠোর শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি অমান্য করার অভিযোগে বিশেষ সামরিক আদালতে অভিযুক্ত সদস্যের বিচার হয় ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়। অন্য কোনও সামাজিক গোষ্ঠী—তা সে যত ক্ষমতাশালীই হোক না কেন নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যে খুব বেশি হলে দোষী সদস্যের সদস্যপদ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু তাকে কোনওভাবে দৈহিক শাস্তিদানের ক্ষমতা তার নেই। এ ব্যাপারে সামরিক বাহিনী অনন্য ক্ষমতার অধিকারী।

(২) দ্বিতীয়ত, সমাজের অন্যান্য ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলির সাথে তুলনায় সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারার সাথে সামরিক বাহিনীর জীবনধারার কোনও সংযোগ বা সঙ্গতি থাকে না। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট ব্যারাকে বসবাস করে। তাদের পোশাক-আশাকে ও আদব-কায়দায় বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাতন্ত্র্য ও সমরূপতা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি তাদের বিশেষ এক ধরনের ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত করে গড়ে তোলা হয়। ("The armed forces in varying degrees emphasise their separation from civilian society by separate barracks, distinctive uniforms and indoctrination of recruits in the history and traditions of that particular branch of armed forces, resulting in a pride in the tradition and a distinct esprit de crops."—Alan R. Ball)

স্বাভাবিক জনজীবন থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যময়তার দরুন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করে। জনজীবন থেকে এই বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে সামরিক বাহিনী নিজেদের মধ্যে এক ভিন্নধর্মী শৃঙ্খলাপরায়ণ সংস্কৃতি ও মানসিকতা গড়ে তোলে যা স্বভাবতই তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীচেতনার জন্ম দেয়।

(৩) দেশের অখণ্ডতা ও নিরপত্তা রক্ষায় বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সামরিক বাহিনীর অপরিহার্যতা ও তার দুঃসাহসিক ভূমিকার দরুন সামরিক বাহিনী কর্তব্যনিষ্ঠা দেশপ্রেমের প্রতীকে পরিণত হয়। এই বাহিনীর মধ্যে যে অভিপ্রেত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা হয় তার ফলে ধরে নেওয়া হয় যে, এই গোষ্ঠী সমাজের যে-কোনও সংকীর্ণ কায়েমি স্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। সাধারণ জনমানসে তাই সামরিকবাহিনী হল স্বদেশপ্রীতি ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক। এই ভাবমূর্তির কারণে সামরিক

বাহিনীকে সামগ্রিক জাতীয়স্বার্থের রক্ষক ও জাতীয় সংহতির পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করা হয়। শুধু জনমানসেই নয়, সামরিক বাহিনীর নিজস্ব গোষ্ঠীগত চেতনাতেও এ জাতীয় ধারণা বেশ প্রবল যে খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠীস্বার্থের সংঘাতে বিপন্ন সমগ্র দেশের ও জাতীয় স্বার্থকে তারাই যথার্থভাবে রক্ষা করতে বা উদ্ধার করতে পারে।

(৪) বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে এবং প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা গৃহযুদ্ধ মোকাবিলা করতে সামরিক বাহিনী বলপ্রয়োগ ও হিংসার সমস্ত হাতিয়ারের উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে। সামরিক বাহিনীর এই অধিকার বৈধ অধিকার হিসেবে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বীকৃত হয়। আর এই স্বীকৃতি ও বৈধতার পিছনে আছে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের অলঙ্ঘনীয় ধারণাটি। আর যেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার প্রতিষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীই চূড়ান্ত অবল¥¤ন তাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ কিছুটা স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হয়।

(৫) অন্যান্য প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে সামরিক বাহিনীর একটি লক্ষ্যণীয় পার্থক্য হল সামাজিক গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে তাদের এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকারই হতে পারে। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে তারা নানাভাবে নানা আন্দোলনে সামিল হতে পারে। কিন্তু সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে সচরাচর এটা দেখা যায় না। একালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তো বটেই এমনকি অস্বাভাবিক বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতেও সামরিক বাহিনীর দ্বারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার বিষয়টি আড়ালে থাকে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাই শুধু নয় তার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা সমাজবিজ্ঞানী মহলে বিশেষ জনপ্রিয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলির সমাজ-রাজনীতিক পটভূমিতে অস্থিরতা ও অস্থিতাবস্থা এবং তার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীরা সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বেশকিছু গবেষণা করেছেন।

সাধারণভাবে বলা যায়, যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়ার উপর সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে সাধারণভাবে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু পশ্চিমের উন্নত রাষ্ট্রগুলো সামরিক বাহিনীর উপর অসামরিক রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে যতটা সাফল্যের সাথে বজায় রাখতে পারে উন্নয়নশীল বা অর্ধোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে নানা বাস্তব পরিস্থিতিগত কারণে তা সম্ভভব হয় না। উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমাজ-রাজনীতিক পরিবর্তন একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পর্কিত তেমনি এর সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের যোগও উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুত, অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিবর্তন প্রক্রিয়া বহুলাংশেই বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আর এইসব বাহ্যিক চাপ—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়ত—প্রতিহত করতে অসামরিক সরকারকে বহুক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সমধর্মী বা সমরূপ নয়। এই ভূমিকার ক্ষেত্রে নানা তারতম্য লক্ষিত হয়। এই তারতম্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে Alan R. Ball এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা মূলত দু'টি পরিবর্তনীয়ের (variable) উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনীয় দু'টি হল : (১) সামরিক বাহিনীর প্রকৃতি; (২) অসামরিক সরকারের শক্তিসামর্থ্য। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, উপরোক্ত দু'টি পরিবর্তনীয়ই রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার নির্ধারক শক্তি।

কোনও একটি দেশের সামরিক বাহিনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে তার রাজনীতিক মনোভাব ও ভূমিকাকে প্রভাবিত করে। সাধারণত সামরিক বাহিনী দেশের অন্যান্য অসামরিক বাহিনীর তুলনায় অধিক পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন। এই পেশাদারী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ মনোভাবের উপর ভিত্তি করে সামরিক বাহিনীর নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধ ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র চেতনা গড়ে ওঠে। কোনও কোনও দেশের সামরিক বাহিনীর এই পেশাদারিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনা অন্যদেশের সামরিক বাহিনীর তুলনায় বেশি অথবা কম হতে পারে। আবার বাধ্যতামূলক নিযুক্তির ভিত্তিতে গঠিত সেনাবাহিনী এবং স্বেচ্ছামূলকভাবে গঠিত সেনাবাহিনীর মধ্যে পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। আবার সেনাবাহিনীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সামাজিক বর্গের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। কোনও কোনও দেশের সামরিক বাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে যেমন এলিট বর্গভুক্তের উপর জোর দেওয়া হয় তেমনি আবার অন্য কোনও কোনও দেশে সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় কৃষিজীবী সম্প্রদায় ও নিম্ন-মধবিত্তের উপর। এই সামাজিক বর্গগত পার্থক্যের দরুন সামরিক বাহিনীর মানসিকতা ও প্রবণতার পার্থক্য সূচিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর বিশেষজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রশাসনিক বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকে বলে সামরিক বাহিনীর শক্তিসামর্থ্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার নির্ধারক শক্তি হিসেবে তাই উপরোক্ত পরিবর্তনীয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার দ্বিতীয় নির্ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পোন্নত উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অথবা একক রাজনৈতিক দলের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা তেমন থাকে না। অন্যদিকে যে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় অসামরিক সরকার জনসাধারণের ব্যাপক অংশের আনুগত্য অর্জনে ব্যর্থ হয় ও মর্যাদা হারায় সেইসব রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বেশি হয়। কিন্তু অসামরিক সরকার সাধারণভাবে যে বৈধতা ভোগ করে কোনও সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে সচরাচর তা দেখা যায় না। তাই বলা চলে যে অসামরিক সরকারের মারাত্মক রকম দুর্বলতা বা ব্যর্থতা না থাকলে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রকৃতপক্ষে অসামরিক সরকার ও সামরিক বাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্ক 'রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ'-এর মতো একমাত্রিক ধারণার দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে না। রাজনীতির সাথে সামরিক বাহিনীর বহুমাত্রিক ও জটিল সম্পর্কটিকে যথাযথ অনুধাবণ করতে তাই একে তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পরিমাণগত মাত্রা ও গুণগত পর্যায় অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Alan R. Ball একে মুখ্যত তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন :

৩২.৫.১ সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন ও সীমিত হস্তক্ষেপ

আপাতবিচারে রাজনীতিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ও সামরিক বাহিনীর কর্মধারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, সামরিক বাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বিশেষত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতিকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে সামরিক বাহিনী বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। একথা বলা বাহুল্য যে, সরকারের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির সঙ্গে অন্যান্য নীতির প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সম্পর্ক বর্তমান এবং ফলত ঐ দুই নীতির উপর সামরিক বাহিনীর প্রভাব পরোক্ষে সরকারের অন্যান্য নীতিকেও প্রভাবিত করে।

উপরন্তু, একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে সামরিক বাহিনী নিজেদের পেশাগত দাবীদাওয়া, চাকুরির শর্তাদি এবং আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা সরকারের কাছ থেকে আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। যেকোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই সামরিক বাহিনী এ ধরনের সীমিত হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ধরনের সীমিত হস্তক্ষেপের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল পররাষ্ট্র বা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনও সরকারি নীতিকে নিজেদের পছন্দসইভাবে সরকারের মাধ্যমে রূপায়িত করা এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দাবীদাওয়া পূরণের ব্যবস্থা করা।

রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর সীমিত হস্তক্ষেপের সুযোগ ও সম্ভাবনা সব দেশে সমান নয়। সাধারণভাবে যদিও উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে সামরিক বাহিনী পরিচালিত হয় তবু এই নিয়ন্ত্রণ সব দেশে সমানভাবে কার্যকর বা কঠোর হয় না যেহেতু সকল উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত ও কাঠামো সমান মজবুত ও সমান ঐতিহ্যসিদ্ধ নয়। তবু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, গ্রেট ব্রিটেন অথবা ভারতবর্ষের মতো উদারনীতিক ব্যবস্থায় এবং গণ- প্রজাতান্ত্রিক চীনের মতো একদলীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসামরিক সরকারের বৈধতাকে সামরিক বাহিনী কখনও তেমন চ্যালেঞ্জ জানায়নি।

তবে যুদ্ধকালীন বা অন্য কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। সম্পর্কের এই ভিন্ন মাত্রা আসলে একান্তভাবে অস্বাভাবিক বা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক ব্যতিক্রমী মাত্রা।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামরিকবাহিনী ছাড়াও অন্যান্য আধা-সামরিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষা, সংকট দূরীকরণ ও সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা প্রতিহত করতে এইসব বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। আবার নাৎসীবাদী বা ফ্যাসিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন নেতার রাজনীতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সুনিশ্চিত করার জন্য এরকম বাহিনী গঠন করা হয়।

সামরিক কর্তৃপক্ষ ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের আর এক বিকল্প মাত্রা হল রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। কিন্তু রাজনীতিতে এই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পরিপূর্ণ সামরিক শাসন বলে

মনে করলে ভুল হবে। বস্তুত, এ হল মধ্যবর্তী অবস্থা। দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর সীমিত হস্তক্ষেপ এবং পূর্ণাঙ্গ সামরিক নিয়ন্ত্রণ বা শাসনের এক মধ্যবর্তী অবস্থাকেই প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যায়।

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ নানা কারণে ও নানা উদ্দেশ্যে ঘটতে পারে এবং এ জাতীয় ঘটনা যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই ঘটা সম্ভভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Ball-এর অভিমত : "Direct interference by the military in politics, but falling short of the assumption of power by the military may occur in any type of political system." তবে প্রধানত যে দু'টি কারণে বা উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে উদ্যোগী হয় তা হল : (১) সামরিক বাহিনীর কোনও সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থসাধন এবং (২) অসামরিক সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, দুর্নীতি অথবা কোনও কায়েমি স্বার্থের অনুকূলে শাসন চালানোর চেষ্টাকে প্রতিহত করতে। তবে লক্ষ্যণীয় হল, উপরোক্ত এই উভয় ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনী নিজেকে সমষ্টিগত জাতীয় স্বার্থের প্রতিভূ ও রক্ষক হিসেবেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, যখন সামরিক বাহিনী নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থেও রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে তখনও ব্যাপক জনসমর্থন লাভের প্রয়োজনে এবং বৈধতা অর্জন করতে তার এই হস্তক্ষেপ প্রয়াসকে সমষ্টিগত স্বার্থেই অনুপ্রাণিত বলে জাহির করে।

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর এই ধরনের হস্তক্ষেপ সাধারণত ক্ষমতাসীন কোনও অসামরিক সরকারকে অপসারিত করে পছন্দসই অন্য এক অসামরিক সরকারকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৬৪ সালে কেনিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডায় সংঘটিত সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী ভূমিকার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সামরিক বাহিনীর এই বিদ্রোহের মূলে যেসব কারণ বর্তমান ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বেতন ও কাজকর্মের অবস্থা সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদগুলিতে আফ্রিকানদের নিয়োগের দাবী ইত্যাদি। তবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে উৎখাত করার সজ্ঞান অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা সামরিক বাহিনীর ছিল না। আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন আরও কয়েকটি দেশে ৬০-এর দশকে এ জাতীয় সামরিক বিদ্রোহ ও হস্তক্ষেপ বিষয়ে অনুসন্ধান করে কোনও সর্বজনীন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবু মোটের উপর বলা যায়, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দীর্ঘকালীন অসন্তোষের সমাধানে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, রাজনীতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অচলাবস্থা ও সংকটের নিরসনে অক্ষমতা ইত্যাদি সামরিক বাহিনীর এই ধরনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে প্ররোচিত করে। তবে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রায় বিরল।

পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণ অথবা 'সামরিক শাসন' বলতে এমন এক অবস্থার কথা বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা সরকারি ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর দখলে থাকে। অবশ্য সামরিক শাসনাধীনে সামরিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রায় ও ঐ নিয়ন্ত্রণের রীতি পদ্ধতিতে পার্থক্যের দরুন সামরিক শাসনেরও রকমফের হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশের রাজনীতিতে ঘন ঘন সামরিক নিয়ন্ত্রণ বা শাসন কার্যকরী হওয়ার মূলে কতকগুলি পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করা যায়।

সাধারণত দেশের অসামরিক শাসক ও রাজনীতিবিদ্‌রা যদি অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ হন এবং জনমানসে যদি তাঁদের সম্পর্কে আস্থা ও শ্রদ্ধার বোধ ক্রমশ নিম্নগামী হয় তবে অন্য বিকল্পের অভাবে জনগণ সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানাতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে সমাজে জনগণের মৌলিক দাবীদাওয়াগুলি যদি ক্রমাগত অবহেলিত থাকে এবং অসামরিক রাজনীতিবিদ্‌, প্রশাসক ও সমাজে কায়েমি বিত্তগোষ্ঠীর অশুভ জোটের ফলে যদি সমাজজীবনে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্তি লাভ করে তবে সামরিক বাহিনীর পক্ষে ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় সমর্থন না থাকলেও অন্তত নিষ্ক্রিয় অনুমোদন থাকে। তবে এই অনুমোদন স্থায়ী হতে পারে না কারণ দেখা গেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সামরিক শাসক জন-বিরোধী ভূমিকা নিতে তৈরি থাকে।

উপরন্তু, কোনও কোনও রাষ্ট্রে আঞ্চলিক ও জাতিগত (ethnic) ভিন্নতার দরুন নানা সংকটের সৃষ্টি হয়, এবং এই ধরনের জাতীয় ও রাষ্ট্রিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য তৎপর হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে নাইজেরিয়ায় সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে। তাছাড়াও বিশ্বের নানা সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রে, বিশেষত যেসব রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের বদলে জাতিগোষ্ঠীগত বা উপজাতিগত আনুগত্যের কারণে রাষ্ট্রিক সংহতি শিথিল সেইসব রাষ্ট্রেও প্রত্যক্ষ সামরিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবার সম্ভাবনা অধিক।

তাছাড়াও সদ্যস্বাধীন বহু দেশে নবগঠিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুরুতে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিপুল প্রত্যাশা সৃষ্টি করেও যদি দীর্ঘদিন ধরে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার সমাধানে ব্যর্থ হয় ও জনগণের মুখ্য অংশের জোরালো আপাত চাহিদাগুলোকে তৃপ্ত না করতে পারে তবে জনগণের পুঞ্জিভূত অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারে গড়ে ওঠা সামরিক বাহিনী নিজেকে দেশের ত্রাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়।

আবার তৃতীয় বিশ্বের বহু অনুন্নত দেশ নিজেদের সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে পশ্চিমী শক্তিবর্গের উপদেশ ও সহায়তা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। ফলস্বরূপ ঐসব বৃহৎশক্তি তাদের স্বার্থবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা গ্রহীতা দেশের সামরিক বাহিনীকে প্রভাবিত করতে পারে। এবং কখনও কখনও এইভাবে বৈদেশিক মদতপুষ্ট হয়ে সামরিক বাহিনী সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়।

সবশেষে আর একটি কথা মনে রাখা উচিত, অনেক সময় সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষ যুগ্মভাবে সরকারি কার্য পরিচালনার কৌশল অবলম্বন করে। বস্তুত, সামরিক শাসকরা নিজেদের সামরিক কর্তৃত্বের প্রতি জনগণের সহনীয়তা ও সমর্থন আদায় করতে এরকম সামরিক-অসামরিক যৌথ সরকার গঠনের পথ ধরে।

রাজনীতিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি ও সামরিক বাহিনীর কর্মধারা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে পরোক্ষ, কখনওবা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। বস্তুত, রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনী অবশ্যই পরিপূরক ভূমিকা

সম্পাদন করে। আর এই পরিপূরক ভূমিকার সুবাদে সামরিক বাহিনী রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রবাবিত করে নানাভাবে।

কিন্তু কখনও কখনও এই পরিপূরক ভূমিকাই রাজনীতিতে এক মুখ্য ভূমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সামরিক বাহিনী বিশেষ বিশেষ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়, অথবা যখন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর এই প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

১। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাজনীতির মুখ্য উপজীব্য বিষয় কী?

২। কী অর্থে সামরিক বিভাগ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত?

৩। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাববৃদ্ধির কারণ ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করুন।

৪। সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৫। রাষ্ট্রে অন্যান্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৬। রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের নির্দ্ধারক উপাদানগুলি কী কী?

৭। কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কম, এবং কেন?

৮। অর্ধোন্নত বা অনুন্নত দেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কেন বেশি থাকে?

৯। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর সীমিত হস্তক্ষেপ বলতে কী বোঝায়?

১০। পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসন বলতে কী বোঝায়?

১১। কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে একটি দেশে সামরিক অভ্যুত্থান বা সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

১২। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের সাথে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসনের পার্থক্য কী?

১। Alan R. Ball : Modern Politics & Government

২। Guttridge W. F. : Military Regimes in Africa

৩। Finer S. S. : Comparative Government

৪। Lucian Pye : Aspects of Political Development

৫। নির্মলকান্তি ঘোষ : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

৬। J. C. Johari : Comparative Politics

৭। সুজিতনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : সামরিক বাহিনী ও রাজনীতি।